প্রসঙ্গ : ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প

দেশে তেল-গ্যাস-কয়লা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের পরিমাণ খুব সীমিত। বিশেষজ্ঞদের মতে নিজেদের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এই সীমিত সম্পদ রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সম্পদে শকুনের চোখ লেগেছে। ৫০ হাজার মানুষকে উদ্বাস্তু করে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে বছরে ৩০০ কোটি টাকা নিট ক্ষতির একটি কয়লা খনি প্রকল্পে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনার জন্য গত ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে আয়োজন করা হয় গোলটেবিল বৈঠকের... লিখেছেন **শামীম সুফী**

গোলাম মোর্তোজা: ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রকল্প নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত কি সেটা দেশবাসিকে জানাতেই আমাদের আজকের এই আয়োজন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তার আগে আমরা ফুলবাড়ীর উপরে একটি ডকুমেন্টারি দেখবো। ডকুমেন্টারিটার নাম 'দুধ-কয়লা' । তৈরী করেছে 'মুক্ত খলা'। পরিচালনা করেছেন মোল্লা সাগর। সহযোগিতায় ছিলেন নাসের আহমেদ, টুটুল, শ্রীকান্ত, বাবু, কফিল আহমেদ, লায়লা,সেলিম প্রমুখ।

(এরপরে 'দুধ-কয়লা' প্রদর্শিত হয়)

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকের গোলটেবিল বৈঠক শুরু করছি। তার আগে যে ডকুমেন্টারিটা দেখানো হলো সেটা সম্পর্কে দুই একটা কথা বলি। ডকুমেন্টারিতে কয়লা প্রকল্পে ফুলবাড়ীর মানুষের তীব্র আপত্তি প্রতিফলিত হয়েছে। খনির ব্যাপারে মানুষ এককথায় 'না' বলেছে। যে বিস্তীর্ণ শস্যের ক্ষেত দেখানো হল কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা বিরান মরুভূমিতে পরিণত হবে। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ হারাবে ভিটে-মাটি। ডকুমেন্টারিতে এসব কথাই উঠে এসেছে। এটা যারা তৈরী করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ।

এখন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ড. শামসুল আলম।

ড. এম. শামসুল আলম : ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পর্কিত সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি ২৬/০১/২০০৬-এ সরেজমিনে ফুলবাড়ী এলাকা পরির্দশনে যায়। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে এ কয়লাখনি বাস্তবায়নে প্রতিবাদ জানায়। এসব ঘটনাবলী বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এদিকে তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এ কয়লাখনি বাস্তবায়ন না করার দাবি জানিয়ে আসছে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে খনির প্রতিবাদে তারা ঢাকা থেকে ফুলবাড়ী অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তাছাড়া এ খনির ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এ বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ।

২। উন্নত ও উন্নয়নগামী বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু ব্যবহৃত জ্বালানি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, এদের মধ্যে

ইতিবাচক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এ সম্পর্কের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক জ্বালানি প্রবাহ বৃদ্ধি অন্যতম পূর্বশর্ত। জ্বালানি প্রবাহ বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। আবার জীবন-মান বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বালানি ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। এভাবেই জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। কোনো দেশের জন্য এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। এ লক্ষ্যেই দেশের সকল মহলের আয়োজন ও প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এ প্রয়াস বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

৩। কয়েক দশক ধরে বাণিজ্যিক/আধুনিক জ্বালানি ব্যবহারের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বে বায়োমাস (Biomass) জ্বালানি ব্যবহার ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ সালে বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মোট জ্বালানি ব্যবহারের ৭৩%। গত দশকে তা নেমে ৫৮%-এ দাঁড়ালেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে এই প্রতিস্থাপিত বাণিজ্যিক জ্বালানি গ্রাহক ছিল মূলত উচ্চ পর্যায়ের সম্পদশালীরা অর্থাৎ দেশের ২০% মানুষ। ফলে উপেক্ষিত থেকে গেছে গ্রাম অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত দশকে বাংলাদেশে রান্নায় গ্যাস, কেরোসিন ও বায়োমাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মোট পরিবারের যথাক্রমে ৩.৪%, ২.০% ও ৯৪.৬% এবং বাতি জ্বালাতে বিদ্যুৎ ও কেরোসিন ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৫% এবং ৮৪.৫%।

৪। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে মধ্যম আয়ের (৳ ২৯৫০/-) দেশসমূহের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৮০১ কেজিওই। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ যদি মধ্যম আয়ের দেশ হতো, তাহলে প্রাপ্ত কয়লা ও গ্যাস দিয়ে মেটাতে পারত বড়জোর ৩ বছরের জ্বালানি চাহিদা। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু এই জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৬৭ কেজিওই এবং পাকিস্তানের ছিল ২৪৩ কেজিওই। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মতো বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর জ্বালানি চাহিদা কোনোভাবেই পূরণ হচ্ছে না। কারণ একদিকে যেমন বাণিজ্যিক জ্বালানির উৎস অপ্রতুল ও অধিকাংশ মানুষেরই তা ক্রয় ক্ষমতার বাইরে, অন্যদিকে অত্যধিক জনঘনত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছে ভয়াবহ দুর্নীতি। তাই ফলপ্রসূ কাজ করার প্রত্যাশায় বাংলাদেশের দরিদ্র অধিবাসীরা যে পরিমাণ জ্বালানি গ্রহণ করে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য-এ হ'ল এখানকার জ্বালানি প্রবাহ ও ব্যবহারের করুণ চিত্র। এ কারণ চিত্র কতটা মর্মান্তিক ও ভয়াবহ তা বোঝা যায়, সম্প্রতি চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদ্যুতের দাবিতে দুই দফায় ১০ জন মানুষের প্রাণহানির ঘটনায়।

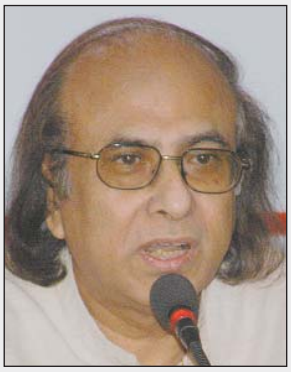

আগে-পিছে বিবেচনা না করে যদি বলা হয় এই জিনিসগুলো আমরা রপ্তানি করব, তাহলে মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। বাংলাদেশের এনার্জি নিরাপত্তাও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এনার্জি নিরাপত্তা নিশ্চিত না করতে পারলে দেশের উন্নয়ন থেমে যাবে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সামিতি

৫। দেশে কয়লা ও গ্যাস মিলিয়ে প্রকৃত অর্থে উত্তোলনযোগ্য কত টিসিএফ জ্বালানি মজুদ আছে? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নেই। সম্প্রতি সরকারের উপর মহলের ব্যক্তি বিশেষের পরিবেশিত এ সংক্রান্ত তথ্য যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে টাটা'র বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প বাস্তবায়নে এশিয়া এনার্জি কোম্পানি প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রে। তথ্য-প্রমাণাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিয়োজিত ফরাসি কোম্পানি মেসার্স বিইসিইপি/ফার্নল্যাব ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১০.৯ টিসিএফ। ২০০১ সালে পেট্রোবাংলা ২২টি গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১১.৬১ টিসিএফ।

* ২০০২ সালে জাতীয় গ্যাস রিজার্ভ কমিটি ২২টি গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১২.০৪-১৫.৫৫ টিসিএফ।

* ২০০২ সালে নাগরিক কমিটি ২২টি গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৬.২ টিসিএফ।

* ২০০৫ সালে পেট্রোবাংলার উপদেষ্টা সংস্থা উড-ম্যাককেনজি ২২টি গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। তাদের তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ (অক্টোবর ২০০৫) ১০.৪১-১৩.৯৫ টিসিএফ। উল্লেখ্য যে, উড-ম্যাককেনজি দু'মাস আগে যে ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করেছিল, তাতে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ (জুন ২০০৫) ৯.২০ টিসিএফ উল্লেখ ছিল। ফাইনাল রিপোর্ট এবং ড্রাফট রিপোর্টে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণের যে তারতম্য রয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৬। সুতরাং উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে বলা যায়, জানুয়ারি ২০০৬ অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৯.০০ টিসিএফ ধারণা করাই শ্রেয়। তারপরও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে যে, ৯.০০ টিসিএফ গ্যাসের সবটুকুই উত্তোলন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা। হরিপুর, মাগুরছড়া এবং টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডের দুর্ঘটনা মানুষের মনে এমন আশঙ্কার জন্ম দেয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ ছিল প্রায় ০.৫১ টিসিএফ। গ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যেই বছরে ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ ১.০০ টিসিএফ ছাড়িয়ে যাবে এমন ধারণা অমূলক নয়। সে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে তা দিয়ে কোনো অবস্থাতেই আগামী ১০ বছরের বেশি চলবে না, এমন ধারণা যে কেউ পোষণ করতে পারে। আজ থেকে ১০ বছর পরে অর্থাৎ ২০১৫ সালের পরে বাংলাদেশের গ্যাসফিল্ডে উত্তোলনযোগ্য কোনো গ্যাস যদি মজুদ না থাকে, তাহলে আগামী ২৫ বছর ধরে অর্থাৎ আজ থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩.২৫ টিসিএফ গ্যাস নিরবচ্ছিন্নভাবে টাটার প্রকল্পে বাংলাদেশ কিভাবে সরবরাহ করবে? সে কারণেই সম্ভবত টাটা বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্যাস মজুদের সার্টিফিকেট দাবি করেছিল।

৭। বিভিন্ন উৎস থেকে দেশের মোট ৫টি কয়লাখনিতে মজুদ কয়লা সম্পর্কে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, জামালগঞ্জ কয়লাখনির মজুদ কয়লা উত্তোলনযোগ্য নয়। সুতরাং জামালগঞ্জ কয়লাখনির কয়লা বাদে বাকি ৪টি খনির মজুদ কয়লার বিবরণ:

* বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এপ্রিল ২০০৩-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে

দেয়া তথ্য অনুযায়ী মজুদ কয়লার পরিমাণ ১৪৭৪ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ ২৮১ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৭.২৭ টিসিএফ ।

* অধ্যাপক বদরুল ইমাম কর্তৃক মে ২০০৩ প্রকাশিত প্রবন্ধে দেয়া তথ্য অনুযায়ী মজুদ কয়লার পরিমাণ ৯৯০ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ ২০৪ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৫.২৮ টিসিএফ।

* সাবেক পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রদত্ত প্রতিবেদনে দেয়া তথ্য অনুযায়ী মজুদ কয়লার পরিমাণ ১০৩২ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ ২২৮ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৫.৯০ টিসিএফ ।

* এশিয়া এনার্জি কোম্পানির মূল্যায়ন রিপোর্টে (অক্টোবর ২০০৫) দেয়া তথ্য অনুযায়ী ফুলবাড়ী কয়লাখনিতে মজুদ কয়লার পরিমাণ ৫৭২ মিলিয়ন টন। কিন্তু উপরে বর্ণিত তথ্যমতে ফুলবাড়ী কয়লাখনিতে মজুদ কয়লার পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০, ৩৫০ এবং ৩৮৬ মিলিয়ন টন। এশিয়া এনার্জি কোম্পানি দেয়া এ তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তাছাড়া এশিয়া এনার্জি কোম্পানির উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন প্রস্তাবও এখন পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

উপরে বর্ণিত তথ্যাদিতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তোলনযোগ্য মজুদ কয়লার পরিমাণ ৫-৭ টিসিএফ ধারণা করা যায়।

৮। বর্তমানে কয়লার ব্যবহার হচ্ছে ইটভাটায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের দেখা যায়, ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ ০.৮৫ মিলিয়ন টন। সম্প্রতি বড়পুকুরিয়ায় ১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাচালিত একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। অচিরেই একই ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে। সুতরাং ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে বছরে মোট ০.৭০ মিলিয়ন টন কয়লা প্রয়োজন হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে (২০০৬) কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে তাতে বোঝা যায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার প্রাধান্য পাবে। অভ্যন্তরীণ কয়লার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে অনস্বীকার্য। ধারণা করা যায়, এ বছরে সে পরিমান ১.৭ মিলিয়ন টন হতে পারে এবং ২০১০ সাল নাগাদ এ পরিমাণ বছরে ২.৫-৩.০ মিলিয়ন টনে- এসে দাঁড়াতে পারে।

৯। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লানের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় বিদ্যুতের চাহিদা ধরা হয়েছিল ২০০৫ সালে ৪৬০০ মেগাওয়াট, ২০১০ সালে ৬৪০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৯৯০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ২০১০ সালের মধ্যেই কমপক্ষে অতিরিক্ত ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করতেই হবে। আর এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনো অবস্থাতেই কয়লার কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য প্রতিবছর ১৪ মিলিয়ন টন কয়লা দরকার। ২০১৫ সাল নাগাদ আরও অতিরিক্ত ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে, সেজন্য অতিরিক্ত আরও ১৪ মিলিয়ন টন কয়লা আবশ্যক। এমতাবস্থায়, এ চাহিদা মেটাতে সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদ ২০২০-২০২৫ সালের মধ্যেই শেষ হবে, এমন ধারণা করা যায়। অবশ্য বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ী কয়লাখনি যদি টাটা ও এশিয়া এনার্জি কোম্পানিকে দেয়া হয় এবং তা থেকে উত্তোলনকৃত কয়লা রপ্তানি করা হয়, তাহলে এ মজুদ বহু আগেই শেষ হবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। উল্লেখ্য লিমিটেড প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে কয়লা রপ্তানির বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী এশিয়া এনার্জি কোঃ ৮০% কয়লাই বিদেশে রপ্তানি করবে। ফলে আগামীতে কি ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হবে তা কি ভাবা যায়?

১০। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত ফুলবাড়ী কয়লাখনি দেশের বড় ধরনের ৫টি কয়লাখনির ১টি। এশিয়া এনার্জি করপোরেশনলিলিটেড এ খনি লিজ পায় এপ্রিল ২০০৪ এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেয় ২ অক্টোবর ২০০৫। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫। এশিয়া এনার্জি'র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্ট এবং খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত রিপোর্ট ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যাদির বিবরণ-

* জরিপ অনুযায়ী এলাকার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পটি সমর্থন করে।

* বাংলাদেশে উম্মুক্ত খনন পদ্ধতি নতুন হলেও এদেশের মতোই ভূতাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থা বিদ্যমান। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও জার্মানিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি খনন ও উত্তোলন সফলভাবে পরীক্ষিত, অধিক ফলদায়ক ও নিরাপদ।

* আনুমানিক ৩০ বছর ধরে খনির খনন প্রক্রিয়াটি কয়লাক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণে অগ্রসর হবে।

* কয়লাখনি ১৩৫ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত হবে। খনির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ ৬৫৬ বর্গকিলোমিটার। ফলে এলাকায় কৃষি জমির ক্ষতি হবে এবং ফুলবাড়ী এলাকার পূর্ব পার্শ এবং এর চারদিকে বসবাসরত জনসাধারণ, গ্রাম ও বসতবাড়ি সরিয়ে নিতে হবে।

* খনির অগ্রগতির ১০ বছরের মধ্যে ১৫-২০ হাজার জনগণকে পুনর্বাসন করতে হবে। ৩০ বছরে উক্ত এলাকার মোট ৫০ হাজার লোককে পনর্বাসিত হতে হবে।

* বেশ কিছুসংখ্যক স্থানীয়, আঞ্চলিক রাস্তা এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রেললাইনের অংশবিশেষ সরিয়ে নিতে হবে।

* নিরাপদ ও শুষ্ক খননক্ষেত্র তৈরির প্রয়োজনে কয়লাখনির অভ্যন্তরীণ ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহ কমিয়ে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে।

* সাধারণ সম্পত্তি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, হাটবাজার, কবরস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এসবের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে।

* সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ প্রায় ৫৭২ মিলিয়ন টন।

* প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বছরে ১.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন হবে। ২০১১ সাল নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে বছরে ১৫ মিলিয়ন টন হবে।

* পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ মিলিয়ন টন রপ্তানি হবে এবং ৩ মিলিয়ন টন দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হবে।

* খনিতে কয়লা ছাড়াও উন্নতমানের খনিজদ্রব্য ও পাথর পাওয়া যাবে।

* উল্লিখিত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ১.৪ (প্রায় টাকা ১০ হাজার কোটি) বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদেরকে না জানিয়েই আমাদের সম্পদের ব্যাপারে শাসকেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এ ব্যাপারে কোনো স্বচ্ছতা নেই, এসব ব্যাপারে চরম দুর্নীতি হয় সেটাও অস্বীকারের কোনো কারণ নেই

রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

কিন্তু ০২.১০.২০০৫-এর সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য অনুযায়ী এ বিনিয়োগের পরিমাণ ১২ (প্রায় টাকা ৭০ হাজার কোটি) বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

* শতকরা ৬ ভাগ রয়্যালটি ও ট্যা মিলিয়ে ৩০ বছরে বাংলাদেশের আয় হবে ৭ (টাকা ৪৬ হাজার কোটি) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বছরে প্রায় ১.৫ হাজার কোটি টাকা।

* খনির কার্যক্রম চলাকালীন প্রত্যক্ষভাবে স্বল্পমেয়াদি ২১০০টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১১০০টি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১১। এসব ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্নে রিপোর্টে বলা হয়েছে, কৃষিজাত জমির সামান্য ক্ষতি ছাড়া খনি এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের ওপর খনির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে খুব সামান্য। উল্লেখ্য যে, এশিয়া এনার্জির এসব তথ্যাদি সময়ে সময়ে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন অক্টোবর ২০০৫ প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে খনির নক্শা পুনঃনির্ধারিত হয়েছে এবং বদলানো হয়েছে। তাতে ৫০ হাজারের স্থলে ৪০ হাজার লোক সরাতে হবে, জমির দরকার হবে ৬.৫ হাজার হেক্টরের স্থলে ৫.৯ হাজার হেক্টর এবং ফুলবাড়ী শহরের অধিকাংশ পূর্বাংশ এখন খনির মধ্যে পড়বে না।

১২। এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী কয়লাখনির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য খনি এলাকায় যেসব বোরিং করেছিল তার মধ্যে দুটিতে আমরা পরিদর্শন করি। একটি বোরিং থেকে কয়লা তোলা হয়। অপরটিতে প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে একনাগাড়ে পানি তোলা হয়। এ থেকে ধারণা করা যায়, কয়লা এবং পানির স্তর থেকে কয়লা ও পানি উত্তোলন করে তার কাঠামোগত তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এরূপ কতটি বোরিং করা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে কয়লা ও পানির স্তর সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়ার জন্য যতগুলো বোরিং করা আবশ্যক ছিল, সে তুলনায় বোরিং-এর সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। সুতরাং সমীক্ষায় বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের যে সুপারিশ রিপোর্টে করা হয়েছে তা সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত নয়। সময়ে সময়ে এসব তথ্যের পরিবর্তন সে সন্দেহ ও সংশয়কে আরোও ঘনিভূত করেছে।

১৩। আমরা ২৫ ডিসেম্বর ২০০৫-এ ফুলবাড়ী কয়লাখনি এলাকা পরিদর্শনে যাই। ঐ দিন অপরাহ্নে দিনাজপুর শহরের নাট্যমঞ্চে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির দিনাজপুর শাখা কর্তৃক ফুলবাড়ী কয়লাখনির ওপর আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় স্থানীয় সুধীবৃন্দের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। সভায় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এ প্রকল্পে বাংলাদেশের ব্যয় হবে ৫৪ হাজার কোটি টাকা এবং আয় হবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এ আয় বাংলাদেশের ১ বছরের রপ্তানি আয়েরও (টাকা ৫০ হাজার কোটি) কম। তাছাড়া প্রতি বছর বিদেশীরা যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় (টাকা ২৫ হাজার কোটি) তার দ্বিগুণও নয়। হিসাব অনুযায়ী এতে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতি বছর বাংলাদেশের ক্ষতি হবে ৩০০ কোটি টাকা। জীবন ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এ হিসাবে আসেনি। এশিয়া এনার্জির দৃষ্টিতে এটাই হলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফা।' ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে এ এলাকায় মরুকরণ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে এমন আশঙ্কা সভায় ব্যক্ত করা হয়।

১৪। ফুলবাড়ীতে আমরা যা দেখলাম, শুনলাম এবং সরকারের বিশষজ্ঞ কমিটি যা স্বচক্ষে দেখেছে এবং নিজ কানে শুনেছে তাতে কি বলা যায় এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবিত ফুলবাড়ী কয়লাখনি সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সমর্থন করে? রিপোর্টে যে মিথ্যে বলা হয়েছে এমন অভিমত না দেয়ার কোনো উপায় নেই। রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিরাপদ ও শুষ্ক খননক্ষেত্র তৈরির প্রয়োজনে কয়লাখনির অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহ কমিয়ে আনতে হবে। ফলে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। সে প্রভাবের ভয়াবহতা ভাবায়। ১১০ মিটার পুরু ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পানি তুলে আনতে হবে এবং সম্পূর্ণ শুকনো করতে হবে। যারা পাশের কয়লাখনি বড় পুকুরিয়া নিয়ে স্টাডি করেছিল তাদের মতে, মিনিটে ৫ লাখ ৮০ হাজার থেকে ৮ লাখ লিটার পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। ফলে এক মাইল ব্যাসার্ধের পুরো জায়গা একেবারেই শুকিয়ে যাবে। ১৩০ মিটার নিচে স্পোপ দিয়ে গাড়ি ওঠা-নামা করবে। ফলে রাস্তা শুকনো রাখা দরকার হবে। কিন্তু এখানকার মাটি নরম, শক্ত নয়। অল্পতেই গুঁড়ো হয়ে যায়। এ মাটি শুকনো রাখতে হলে যে পরিমাণ পানি সরিয়ে নিতে হবে তাতে আশপাশের কূপ, নলকূপ, পুকুর, খাল-বিল শুকিয়ে যাবে। পরে এ পানি রিচার্জ করা হলেও ইকোলজির ভারসাম্য বিপন্ন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কয়লা খননের পর খননকৃত স্থল ভরাট করা হলেও যে টপ-সয়েল নষ্ট হবে তা ফিরে পাওয়া কঠিন। যে জমি হাজার হাজার বছর ধরে ফসল জন্ম দিয়ে খাদ্য যুগিয়েছে, ক্ষুধা মিটিয়েছে, সে জমি উৎপাদনশীলতা হারাবে। সে ক্ষতির ভয়াবহতা কি ভাবা যায়?

১৫। বাংলাদেশ বৃষ্টি-বাদলের দেশ। এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ১০০ বা ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেই এখানকার পথ-ঘাট, মাঠ-ময়দান, হাট-বাজার সবকিছু পানির নিচে চলে যায়। তাহলে বর্ষায় আদৌ কি কয়লাখনি শুকনো রাখা সম্ভব হবে? ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লাখনি কি আদৌ বর্ষার পানিতে প্লাবিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই? এশিয়া এনার্জির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মতো ভূতাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থা বিদ্যমান অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও জার্মানিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি খনন ও উত্তোলন সফলভাবে পরীক্ষিত, অধিক ফলদায়ক ও নিরাপদ। এই যুক্তিতে ফুলবাড়ী কয়লাখনি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন ও কয়লা উত্তোলন করার কথা ভাবা যায় না। তাছাড়া ফুলবাড়ী ঘনবসতি অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ২ হাজার ৫০০-র বেশি জনবসতি এবং উর্বর কৃষিজমি সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান এলাকা। সাধারণত যেসমস্ত এলাকায় উন্মুক্ত কয়লাখনি দেখা যায়, সেসব এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ নয়। মরু বা পাহাড়ি এলাকা। মাটি শক্ত। সেখানে খুব একটা বৃষ্টিপাত হয় না। ভূগর্ভস্থ পানি সমস্যা নয়। মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, কৃষি জমি ধ্বংস করা লাগেনি। জনবসতি উচ্ছেদের প্রয়োজন হয়নি। এ ক্ষেত্রে যে অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দেয়া হয়েছে, সেখানকার জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৬ জন। ভারতের জনসংখ্যা বেশি হলেও তা ৭২০ জন। তাহলে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও জার্মানির মতো ফুলবাড়ীতেও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি খনন ও কয়লা উত্তোলন ফলদায়ক ও নিরাপদ বলা যায় কি? অবশ্য এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে এসব ক্ষয়-ক্ষতি শুধুই 'সামান্য ক্ষতি'। কয়লাখনি প্রকল্পে যা খরচ হবে তা বাদ দিয়ে অর্জিত আয়ের ৬% বাংলাদেশ পাবে এমন

উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের যে সুপারিশ রিপোর্টে করা হয়েছে তা সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত নয়। সময়ে সময়ে এসব তথ্যের পরিবর্তন সে সন্দেহ ও সংশয়কে আরোও ঘনিভূত করেছে

ড. শামসুল আলম
পরিচালক, ইনিস্টিটিউট অব এনার্জি টেকনোলজি
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শর্তে এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী কয়লাখনি চাইছে। কত খরচ হবে? কীভাবে খরচ হবে? সে হিসাব-নিকাশে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে দুর্নীতির আশ্রয় নেবে সে আভাস এখনই স্পষ্ট। হরহামেশাই হচ্ছে তথ্যের পরিবর্তন। ঘটছে তথ্যের বিভ্রাট। তাই ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পকে ঘিরে এশিয়া এনার্জির আচার-আচরণে ইতিমধ্যেই মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

১৬। ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে ৮০% কয়লাই রপ্তানি হবে। ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, এখনই দেশে জ্বালানি ঘাটতি নয়, রীতিমত জ্বালানি সংকট তথা দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে। এ অবস্থায় গ্যাসই হোক আর কয়লাই হোক, কোনো বিবেচনাতেই তা রপ্তানি বা বেচে দেয়ার কথা ভাবা যায় না।

১৭। জ্বালানি খাত আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা পায়নি। দাতাদের ঋণ ও অনুদানে গড়ে ওঠা জ্বালানি খাত অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে শুধু সরকারের উপরেই নয়, বিদেশী দাতাদের উপরেও। দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের চুরি রোধে কেউ এগিয়ে আসেনি। চুরির হিসাবও কেউ রাখেনি। চুরির সুযোগই আরো চুরিতে উৎসাহী করেছে, জ্বালানি খাতকে করেছে দাতামুখী এবং এ খাত ক্রমান্বয়ে হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত। সংস্কারের নামে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানিতে রূপান্তরিতকরণ সংকট মোচনের উপায় বললে ভুল হবে; দাতাদের কাছ থেকে বৈদেশিক সাহায্য পাবার কৌশল বলাই শ্রেয়। ফলে সংস্কারে সংকট নিরসন হতে পারিনি, বরং আরো জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। সরকার আগে সেবায় সম্পৃক্ত ছিল, সংস্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হলো এবং জ্বালানি খাতে বহুমুখী দুর্নীতি বিকাশের পথ সুগম হলো।

১৮। তাই এ শতাব্দীর পাদদেশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এখন জ্বালানি সেক্টর নিয়ে বিপাকে পড়েছে। কারণ গত দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশ দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করে বিদেশী কোম্পানিকে গ্যাস উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়ে নিজেই নিজের গ্যাস আমদানি করছে। বিদেশী কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় যে মূল্যে গ্যাস কিনছে, অর্ধেকেরও কম মূল্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে দেশীয় মুদ্রার সেই গ্যাস বিক্রি করছে। ফলে গত দশকের শেষের দিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে। এ ক্ষতির পরিমাণ গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। অথচ ১৯৯৫ সালে যখন পেট্রোবাংলাকে দিয়ে গ্যাস উত্তোলন করা হতো, তখন ১৩৫ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এ দশকে কয়লা নিয়েও একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে চলেছে। প্রস্তাবিত কয়লানীতি সে কথাই বলে। ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প তারই সূচনা। উল্লেখ্য যে,

ওপেন পিকে গেলে ৯০ শতাংশ রিকভারি করা যায়। তাই কোল পলিসিতে যে বলা হচ্ছে প্রথমে ২০ মিলিয়ন টন এবং পরে ৪০ মিলিয়ন টন করে কয়লা উৎপাদন করা হবে, তার মানে তারা আরো ওপেন পিক মাইনিংয়ের পরিকল্পনা করছে

অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম
ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বক্তব্য অনুযায়ী এ প্রকল্পের কারণে ক্ষতির শিকার হতে হবে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ কোটি টাকা।

১৯। কোনো কোনো বছর গড়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ২০%-এরও বেশি জ্বালানি খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দ অপ্রতুল হলেও দাতাদের শর্তাধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণেই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একদিকে যেমন সুষম হয়নি, অন্যদিকে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেম লস ও দুর্নীতির কারণে প্রধান প্রধান দাতারা বৈদেশিক ঋণ প্রদান বন্ধ করায় জ্বালানি খাতের বিপর্যয় আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

২০। এ শতাব্দীর ক্ষমতার প্রধান উৎস জ্ঞান। তাই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি এবং যথোপযুক্ত মানব সম্পদ গড়ে তোলা এখন উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশগুলোর জন্য মৌলিক কাজ। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, স্বাধীনতার পর ৩৫ বছরেও বাংলাদেশে জ্বালানি খাতের জন্য যথোপযুক্ত মানব সম্পদ গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু এ খাতের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাদের ব্যর্থতা তাদের অবলুপ্তিকে আমন্ত্রণ করেছে এবং জ্বালানি খাতকে ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল করেছে বিদেশী পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞর। পক্ষান্তরে বিদ্যুতের লোড শৈডিং, নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত মানের বিদ্যুৎ না পাওয়া, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, অপ্রতুল গ্যাস সরবরাহের কারণে কলকারখানা বন্ধ ও রান্নায় বিড়ম্বনা, গ্যাস ও বিদ্যুতের অসহনীয় সিস্টেম লস - এসব সমস্যা সমাধানে কয়লা হতে পারত একটি শক্তিশালী অবলম্বন। কিন্তু প্রস্তাবিত কয়লানীতি ও ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প কি সে সম্ভাবনার অপমৃত্যুর রূপরেখা?

২১। আশির দশকে মার্গারেট থ্যাচার সম্পদের প্রশ্নে ব্রিটিশ জনগণের মনোভাব ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেন এবং ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করেন। রাষ্ট্রের Regulatory আচরণ Promotional আচরণে রূপ নেয়। পূর্বে যে কোম্পানি বোর্ড ও নির্বাহী কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হতো; এখন সে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নিয়োগকৃত ও তাদের কাছে জবাবদিহিকৃত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং আগের তুলনায় অধিকতর লাভবান হচ্ছে।

২২। জ্বালানির যে উৎস আমাদের রয়েছে তা দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো আমরা উন্নতি করতে না পারলেও মাথাপিছু ১ হাজার ডলার আয়ের দেশ হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের দেশকে দেখতে পারি অনায়াসেই। সে জন্য গড়ে তুলতে চাই বহুবিধ ইন্ডাস্ট্রি এবং চাই উৎপাদনে কয়লা ও গ্যাসের সু-সম্পৃক্ততা। সে জন্য বৃটেনের অনুরূপ দরকার আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বর্তমান প্রজন্মই আনতে পারবে সে পরিবর্তন এবং গড়তে পারবে অধিকতর দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল, স্বয়ংসম্পর্ণ শিল্প সম্পর্ক, সু-সংঙ্গতিপূর্ণ সমাজ; সামাজিক দুর্নীতি উচ্ছেদ ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলতে পারে একটি জাতীয় দৃঢ় অঙ্গীকার।

২৩। রপ্তানি করা বা বিদেশী কোম্পানির কাছে বেঁচে দেয়ার মতো কয়লা বা গ্যাস আমাদের নেই। যেটুকু আছে তা আমাদের চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। এ কারণে আমরা টাটা বা এশিয়া এনার্জিকে গ্যাস ও কয়লা কোনোভাবেই দিতে নারাজ।

এ বক্তব্য ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : আমি আমার, সাপ্তাহিক ২০০০ এবং এই গোলটেবিলের পক্ষ থেকে ড. শামসুল আলমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনার প্রবন্ধটি তথ্যবহুল এবং এতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় উঠে এসেছে। প্রবন্ধটি শোনার পর যে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের সবার মনে উদিত হয়েছে এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আসলে আমাদের কয়লার মজুদ কত? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সুড়ঙ্গ এবং উন্মুক্ত কোন পদ্ধতিতে কতটুকু কয়লা উত্তোলন করা যাবে? কোন পদ্ধতিতে কতটুকু

ক্ষতি হবে? ক্ষতি বলতে অন্যান্য ক্ষতির সাথে আমি জমি, বাড়ি এবং অবকাঠামোর ক্ষতির কথা বোঝাচ্ছি। তারপর রয়েছে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে বা চুক্তি হওয়ার কথাবার্তা চলছে সেটার ধরন কী রকম, সে প্রশ্নটি। চুক্তির ফলে দেশের মানুষের কতটুকু ক্ষতি বা লাভ হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে দেশ, মানুষ ও পরিবেশের কথা কতটুকু ভাবা হয়েছে সে বিষয়টা নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব রাশেদ খান মেননকে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

রাশেদ খান মেনন : খনিজ সম্পদ নিয়ে দেশের রাজনীতিক বা সাধারণ মানুষের খুব বেশি মাথাব্যথা ছিল না। প্রথমে গ্যাস আবিষ্কৃত হল, পরে দেখলাম আমাদের কয়লাও রয়েছে। তবে গ্যাস-কয়লা নিয়ে বিদেশী কোম্পানি আর আমাদের দেশের সরকার যেসব কাজ শুরু করেছে সেগুলো যে আত্মঘাতী, সেটি আমাদের জানা ছিল না। এই বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ এবং তেল-গ্যাস-কয়লা-খনিজসম্পদ রক্ষা নাগরিক কমিটিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। আমি ওপেন পিক পদ্ধতিতে খনি খননের বিষয়টি নিয়ে বেশ দ্বিধার মধ্যে আছি। এতে কার কতটুকু লাভ হবে সেটা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদেরকে না জানিয়েই আমাদের সম্পদের ব্যাপারে শাসকেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এ ব্যাপারে কোনো স্বচ্ছতা নেই, এসব ব্যাপারে চরম দুর্নীতি হয় সেটাও অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। কয়লানীতির যে খসড়াটা আমাদের দেওয়া হয়েছে সেটাকে ঘোলাটে বলে আমার মনে হয়েছে। কয়লা নীতির ওপরও আলোচনা হওয়া দরকার। যেখানে খনি খনন করা হবে সেই অঞ্চলের জনজীবনে এর কী প্রভাব পড়বে সে বিষয়টা আমরা আলোচনায় রাখি না এবং রাখতেও চাই না। ওপেন পিক পদ্ধতিতে যদি কয়লা খনি খনন করা হয়, তাহলে কী হবে? তাহলে কী পরিবেশ দূষিত হবে? আমার মনে আছে বড়পুকুরিয়া যখন চীনকে দেওয়া হচ্ছে সে সময় এখন যিনি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, তিনি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন বড়পুকুরিয়া যেন চীনকে না দেওয়া হয়। সেই চিঠি আমাকে মোর্শেদ খান সাহেব দেখিয়েছিলেন। তখন তিনি ব্যবসায়ী। চেনি তখন বলেছিলেন, ওই পদ্ধতিতে যদি কয়লা খনি খনন করেন (সুড়ঙ্গ পদ্ধতি) তাহলে পরিবেশ নষ্ট হবে। অর্থাৎ ওপেন পিক নয়, যদি সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতেও খনি খনন করা হয়, তাহলে সেটা পরিবেশ নষ্ট করবে। কারণ সেটা খনন করার দায়িত্ব চীনকে দেয়া হচ্ছে এবং মার্কিনিদের যে পরিকল্পনা বা স্বার্থ তার সাথে ব্যাপারটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আজকে আমরা যখন বলছি, ওপেন পিক পদ্ধতিতে খনি খনন করলে পরিবেশ নষ্ট হবে, তখন কিন্তু তারা বলছে - না, এটা পরিবেশ নষ্ট করবে না। তাই এ বিষয়গুলো আলোচনায় আসা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো এবং যে বিষয়টি আমাদের ১৪ দলের আলোচনায় রয়েছে সেটা হচ্ছে- আমাদের খনিজ সম্পদের মালিক জনগণ। অথচ এ বিষয়ে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। রাষ্ট্রের সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে বলা আছে সম্পদ জনগণের বিষয়। সে ক্ষেত্রে এই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার কীভাবে করব, তা আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে। নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেমন শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে, সেচকাজে এবং অন্যান্য সেক্টরের প্রয়োজন মিটিয়ে যদি উদ্বৃত্ত থাকে, কেবলমাত্র তখনই আমরা রপ্তানির কথা ভাবব। তিনটি ব্যাপার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বচ্ছতা। সরকার সবই করছে, কিন্তু কী করছে তা আমরা জানি না। মুশকিল হচ্ছে, আমাদের জানার আগ্রহও কম। পার্লামেন্টে বিষয়টি নিয়ে কখনো আলোচনা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। এখনোও যে পার্লামেন্টের কোন সদস্য আগ্রহভরে এসব জানতে চাইছেন এমন নয়। সেটা এই কারণে যে আপনারা জানেন পার্লামেন্টে আমাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। খনিজসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প কী ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি? নিশ্চিতভাবে এশিয়া এনার্জি তাদের মুনাফার কথা চিন্তা করেই কাজ করবে এবং আমাদের বঞ্চিত করার সব ধরনের ব্যবস্থা তারা নেবে। এ কারণে আমাদের একটা জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। ফুলবাড়ীর মানুষ যদি এটাকে মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে তারা মানছে এই কারণে যে তাদের সামনে কতগুলো প্রলোভন তুলে ধরা হচ্ছে। তোমাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করব। থাকার জন্য হাউজিং দেব ইত্যাদি। যারা উপরতলার নেতা, ইতোমধ্যেই তারা নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নিতে না পারি, তাহলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হবে না। এখানে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তারা দেখবেন আমাদের দেশের বাপেক্সকে দিয়ে বা পেট্রোবাংলাকে দিয়ে এই কাজ করানো যায় কি না। আমাদের যদি টাকা না থাকে তাহলে আমরা বন্ড ছেড়ে টাকা তোলার চেষ্টা করব। তবু বিদেশী কোম্পানির হাতে দেশের কয়লা তুলে দেব না। তবে কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কয়লা উত্তোলন করব, সে ব্যাপারে আমাদের আগেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তার মানে কয়লার ব্যবহার আমাদের করতেই হবে। আমরা তো নিশ্চয়ই মাটির তলায় কয়লাটা রেখে দেব না। তারা যেটা বলছে যে মাটির তলায় রেখে লাভ কী- এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের দিতে হবে। বলতে হবে যে দেখ মাটির তল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে আমরা এটা ব্যবহার করছি। এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ জনাব রাশেদ খান মেনন। তিনি কয়লানীতির অস্বচ্ছতার কথা বলেছেন। মাটির নীচ থেকে কয়লা তুলে ব্যবহার করার কথাও বলেছেন। এসব বিষয় নিয়ে এবার বলার জন্য অনুরোধ করছি জনাব নুরুদ্দিন কামাল সাহেবকে।

রাজনীতিকে যদি নিয়মের মধ্যে না আনতে পারা যায়, একে যদি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে না পারা যায়, তাহলে লুটপাট, ধ্বংস ইত্যাদি চলতেই থাকবে

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত *এম পি*
প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল : ধন্যবাদ। বিশেষ করে ধন্যবাদ ড.শামসুল আলম সাহেবকে। একটা কমপ্রিহেনসিভ পেপার উনি দিয়েছেন। যে বিষয়টা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তুলেছেন, সেখান থেকে আমি শুরু করি। সেটা হচ্ছে কয়লানীতি। ৮ ফেব্রুয়ারিতে সরকার এ নিয়ে আলোচনা করেছে। ওখানে কে কে ছিলেন আমি জানি না। আমি দাওয়াত পাইনি। তবে আমার কয়লানীতিটা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। যতদূর আমার মনে হয়েছে, এটা তৈরি করা হয়েছে একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে। কোল পলিসিটা শুরু করেছে কয়লা মজুদের একটা ধারণা দিয়ে। তবে যে মজুদের কথা ওরা বলছে তা কনট্রাডিকটিং। শুরুতেই বলা হয়েছে আমাদের ১৪০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই। চিন্তার খোরাক হিসেবে তারা বলছে, এটাকে রপ্তানিমুখী করা উচিত। ইন্টিগ্রেট করা উচিত আমাদের রিজিয়নাল কো-অপারেশনের জন্য। এখন দেখুন, আমাদের দেশে কয়লার ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। তার আগেই ওনারা

অথচ কয়লার মূল্যের মতো একটা দারুণ গুরুত্বপুর্ণ ইস্যু এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে আলোচনা তো করেইনি, বরং বলেছে, 'দ্য প্রাইস শুড বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য লিসি' অর্থাৎ কাজ পাওয়া কোম্পানিই ঠিক করবে কয়লার মূল্য কত হবে

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল
সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ইন্টিগ্রেট করতে চাচ্ছেন রিজিয়নাল কো-অপারেশনের জন্য। রিজিয়নাল কো-অপারেশন থাকলে না এ সব কথাবার্তা বলা যায়। কয়লানীতির দুটো অংশ রয়েছে। প্রথমে রয়েছে ভিশন স্টেটমেন্ট। এখানে ব্যকগ্রাউন্ড ও কারেন্ট স্ট্যাটাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে মূল পলিসিটা। এটা এই কারণে যে মাইনিং টেকনোলজির ওপর তারা একটা ওভাররাইডিং কথাবার্তা বলছেন। ১৪০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে, সেহেতু ওপেন কাস্ট মাইনিং হলে ৮০ শতাংশ-৯০ শতাংশ কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। বলা হচ্ছে, প্রথম দশ বছর প্রতি বছরে ১০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হবে। পরের ১০ বছরে করবে ২০ মিলিয়ন টন করে। খনন শুরু হবে ২০০৬ সাল থেকে। এই কয়লানীতি কে তৈরি করেছে আমি জানি না। আইএএফসির কথা বলা হচ্ছে, যদিও আমার মনে হয় এশিয়া এনার্জি এটা তৈরি করে দিয়েছে। মাস ছয়েক আগে এশিয়া এনার্জির একটা লিফলেট আমি পড়েছি। সেখানে লেখা ছিল- কোল পলিসি বাই জানুয়ারি। কোল পলিসির আনুষঙ্গিক বিষয়াদী সম্পর্কেও সেখানে বলা ছিল। সেই কথাগুলোই কোল পলিসিতে এসেছে। তাছাড়া আরেকটা মজার কথা হচ্ছে, ২০১১ সালের পর এ দেশে কোনো গ্যাস বেসেড বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। ঠিক একই কথা কিন্তু কোল পলিসিতেও আছে। তারা বলছেন, কয়লার তো কোনো অসুবিধা নেই। যথেষ্ট কয়লা আছে দেশে। ১৯৯৫ সালে যখন এনার্জি পলিসি করা হল, তার আগেই কিন্তু পেট্রোলিয়াম পলিসি ছিল। সেই পেট্রোলিয়াম পলিসিকে ইন্টিগ্রেট করা হলো। এই কোল পলিসিটাকে কিন্তু পেট্রোলিয়াম পলিসির সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা হয়নি। তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক সাধনও করা হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। এখানে তথ্যাদি যা দেওয়া হয়েছে, আমার কাছে সেগুলো সঠিক বলে মনে হয়নি। তথ্যগুলো উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি খননের পক্ষে জোরাল সমর্থন যোগাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম তথ্য এখানে কীভাবে এল? তথ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণত একটা কমিটি কাজ করে। তারা প্রথমে স্টাডি করে, তারপর বিশ্লেষণ করে। ঠিক করে যে কোন পদ্ধতিটা বা কোন মাইনিং টেকনোলজিটা কোথায় প্রযোজ্য। এখানে এরকম কিছু হয়েছে কি না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে রয়্যালটির। আমাদের দেশে মাইনিং সম্পর্কিত সে রকম স্পষ্ট কোনো আইন-কানুন নেই। তবে যা আছে, তাতে বলা আছে রয়্যালটি হবে ৬ শতাংশ। এর সঙ্গে ট্যাক্স এবং আরো কিছু বিষয় যোগ হবে। কোল পলিসিতে কিন্তু এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়নি। অন্য যেসব অপশন কোল পলিসিতে আলোচনা করা উচিত ছিল, সেগুলোও আলোচনা করা হয়নি। একটা সত্যিকারের কমপ্রিহেনসিভ স্টাডি করার পরই কেবল কোল পলিসিটাকে স্পষ্ট রূপ দেওয়া যেত। আলোচনা করা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এখন কোল পলিসিটা পলিসি না হয়ে একটা বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে। এটা এটা এটা করতে হবে। পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। কোনো অপশনও নেই। তাই আমি অন্তত এটাকে পলিসি হিসেবে দেখতে রাজি নই। আরো মজার কথা হচ্ছে, পলিসিটার শেষে একটা এক্সটেনশন আছে। সেই এক্সটেনশনে ৬-৭টা কোম্পানির কোন কোম্পানিকে কোন খনিটি কী পদ্ধতিতে খনন করতে দেওয়া হবে তার একটা তালিকা দেওয়া আছে। বড়ই অদ্ভুত। অথচ কয়লার মূল্যের মতো একটা দারুণ গুরুত্বপুর্ণ ইস্যু এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে আলোচনা তো করেইনি, বরং বলেছে, 'দ্য প্রাইস শুড বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য লিসি' অর্থাৎ কাজ পাওয়া কোম্পানিই ঠিক করবে কয়লার মূল্য কত হবে। যেহেতু মালিক কোনো ইস্যু নয়, কাজেই মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে তার কোনো পলিসি নেই। কিন্তু মূল্য কারা নির্ধারণ করবে তা বলে দিয়েছে। যারা খনির লিজ নিয়েছে তারাই কয়লার মূল্য নির্ধারণ করবে। পলিসিতে এসেসমেন্টমূলক বা আইনগত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। কাজেই কতগুলো প্রশ্ন এখানে এসে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে আলোচনা না করে আমরা কীভাবে একটা পলিসি দাঁড় করালাম? ভারতে ৬০ হাজার ৬০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে। তার ০.৫৩% তারা উৎপাদনে এনেছে। প্রতি বছর তারা ৩২০-৩৫০ টন উৎপাদন করছে। এ বছর বোধহয় তারা ৩৫৯-৩৬০ টন উৎপাদন করবে। চীনে কয়লা আছে ৬ লাখ ১০ হাজার ৮০০ মিলিয়ন টন। তারা প্রতি বছর উৎপাদন করছে ১৫০০ মিলিয়ন টন। চীনের প্রডাকশনটা ০.২৫% এরও কম। আমেরিকায় ১ লাখ ৫ হাজার ৯৭২ মিলিয়ন টন কয়লা আছে। ওরা বছরে উৎপাদন করছে ১০০০ মিলিয়ন টন, যা তাদের মোট মজুদের ০.৮৯%। আমাদের কয়লার মজুদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এখানে ১৪০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে। আমার কাছে এটাকে এবস্যুলেটলি কাল্পনিক তথ্য বলে মনে হচ্ছে। এই কাল্পনিক তথ্য যারা দিতে পারেন, তারা অবশ্য এ কথাও বলতে পারেন যে দেশে ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট সমপরিমাণ গ্যাস আছে। কাজেই এই পলিসিতে আমাদের কোন অবজেকটিভ নেই। এ ধরনের কোনো আইটেমই এখানে নেই।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : রয়্যালটি অব হোয়াট?

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল : ৬% রয়্যালটি অব প্রডাকশন।

রাশেদ খান মেনন : প্রতি বছর আমরা কতটুকু করে কয়লা দিচ্ছি? প্রজেক্টের কত?

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল : প্রজেক্টের তো নেই, এখন বছরে ১০ মিলিয়ন করে এবং পরবর্তীতে ২০ মিলিয়ন করে দিতে হবে। যার ফলে আমাদের মোটামুটি সব কয়লাই শেষ হয়ে যাবে। দেশের জন্য কিছু থাকবে না।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ জনাব নুরুদ্দিন কামাল। আপনি কোল পলিসি নিয়ে বললেন। আমি মনে করি কোল পলিসি নিয়ে আরো বেশি আলোচনা হওয়া উচিত। আশা করছি এটা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কিছু দিনের মধ্যেই আমরা করব।

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল : আমি আসলে ওনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। কোল পলিসি বলে তো কিছু হয়নি। যা কিছু হয়েছে সেগুলো এশিয়া এনার্জির লিখে দেওয়া প্রস্তাব। সত্যিকারের একটা কোল পলিসি হলে তবেই না আপনি সেটা নিয়ে কথা বলবেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ। এখন আমি বিচারপতি গোলাম রব্বানীকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

বিচারপতি গোলাম রব্বানী : আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই এবং সে কারণে আমি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখছি না। আপনারা যারা বিশেষজ্ঞ তারা ভাবছেন, বাহ রে! দেশে কয়লা পেয়ে গেছি। আমরা কিছু বেচব, কিছু খাব এবং ধনতন্ত্রী দেশের কাতারে গিয়ে দাঁড়াব। আমি সেভাবে এটা দেখছি না। কারণ আমাদের দেশটা ধনতন্ত্রী দেশ নয়। এটা মুক্তিযুদ্ধে অর্জন করেছে আমাদের

জনগণ। আমাদের দেখতে হবে কয়লা উত্তোলনের ফলে জনগণের কোনো মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না। আপনারা দেখুন, বাংলাদেশ সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদে সম্পত্তি সংরক্ষণের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে, যদিও সেটা অপর্যাপ্ত এবং সঙ্কুচিত। যে মাটির নিচে কয়লা খনিটি অবস্থিত, হতে পারে সেটা সরকারের কিন্তু উপরেরটা তো মানুষের। সেই সম্পত্তিটা নিতে হলে আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, আইনের দৃষ্টিতে যে ক্ষতিপূরণটা দেওয়া উচিত সেটা এবং কয়লার দামটা সমান কি না। ভূমি অধিগ্রহণ যে আইনটা আছে, সেখানে বলা আছে সম্পত্তির যে ফসল হবে সে ফসলের একটা আনুপাতিক মূল্য সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করে দিতে হবে। জমির উপরে যদি গাছপালা থাকে, তাহলে সেগুলোর দামও পরিশোধ করতে হবে। আমরা কেউ হিসাব করে দেখছি না জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য যে ক্ষতিপূরণটা দিতে হবে সেটার সঙ্গে আমরা যে কয়লাটা পাব তার দাম সমান কি না বা কম বেশি কি না। তারপর কবরস্থান কোনো সময়ই অধিগ্রহণ করা যাবে না। আমরা দেখছি এখানে কবরস্থান আছে। তো সেই জায়গার নিচে কয়লা খনিই থাকুক আর সোনার খনিই থাকুক, কারো মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে আমি সেটা তুলতে পারি না। কাজেই রাষ্ট্র বড় না মানুষ বড়- এই মৌলিক প্রশ্নটা আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ বিচারপতি গোলাম রব্বানী। রাষ্ট্র বড় না মানুষ বড় সেই প্রশ্নটা তিনি উত্থাপন করেছেন। সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এবারে আনু মোহাম্মদ।

আনু মোহাম্মাদ : ধন্যবাদ। আজকের আলোচনার বিষয় মূলত ফুলবাড়ী কয়লা খনি। বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্টে আমি আলোচনা করব। তবে প্রথমে বিচারপতি গোলাম রব্বানীর যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যে রাষ্ট্র বড় না মানুষ বড়। এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে রাষ্ট্র এবং মানুষ উভয়ের চাইতে মুনাফা বড় এবং করপোরেট বডির স্বার্থ বড়। সিম্পলি এই বিষয়টা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে বুঝতে পারব যে কীভাবে কয়লানীতির ভাষা এবং এশিয়া এনার্জি করপোরেশনের কথাবার্তা মিলে যায়। এখন ফুলবাড়ীতে বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারটা যদি না ঘটে বা ওপেন পিক মাইনিং যদি না হয়, তাহলে এর বিকল্প কী? এক কথায় বিকল্প হচ্ছে ঘাড়টা ঘোরানো। ঘাড়টা যেদিকে আছে, চোখটা যেদিকে আছে, সেদিকে না রেখে একটু ঘোরানো। কয়লানীতিটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে ঘাড়টা কোনদিকে ঘোরাতে হবে। এটা শুরুই হয়েছে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে- দেশের মানুষের পক্ষে বা আমাদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের কোন যোগ্যতা বা দক্ষতা নেই। এখন যেহেতু আমাদের কোনো যোগ্যতা বা দক্ষতা নেই, সুতরাং বিদেশী কোম্পানীকে ডাকতে হবে। যেহেতু ফরেন কোম্পানি আসবে, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হবে, সেহেতু তাদের পকেটের দিকটা আমাদের দেখতে হবে। সুতরাং তারা যা চাইবে, যেভাবে চাইবে, আমাদেরকে সেটা সেভাবে করতে হবে। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পে এশিয়া এনার্জি যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেই প্রস্তাব অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি, তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেই তাহলে আগামী ২০-৩০ বছরে সেখানে একটা বিরাট মরুভূমি তৈরি হবে। লক্ষাধিক মানুষ হারাবে বাস্তুভিটা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে শুরু করে সবুজ জমি পর্যন্ত সবকিছু প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে সে অনুসারে প্রায় ৭৫% কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হবে। এই কয়লা রপ্তানি হলে কী বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বড়বে? এর সোজা জবাব হচ্ছে, বাড়বে না। কারণ উৎপাদন মালিকানা তো আমাদের হাতে থাকবে না। মালিকানা থাকবে বিদেশী কোম্পানির হাতে। সুতরাং কয়লা রপ্তানি করে তাদের মুনাফার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ কী পাবে? বাংলাদেশ সেখান থেকে রয়্যালটি পাবে। রয়্যালটি এবং করের পর বাংলাদেশের কত টাকা থাকবে? যেটা আমি হিসাব করে দেখলাম তাতে বছরে বাংলাদেশের ৩০০ কোটি টাকা লোকসান হয়। এই হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। সম্পদটা বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে, পরিবেশটা ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে। ভাবখানা এমন যা কিছু হয় হোক, লোকসান বাড়তে থাকলে থাকুক। লোকসান বা ঘাটতি বাড়লে তো কোনো অসুবিধা নেই। বিশ্বব্যাংক আছে, তারা দিয়ে দেবে। বিশ্বব্যাংকের ঋণের টাকায় আমরা এই লোকসানটা পুষিয়ে নেব। আর তারপরও যদি ঘাটতি থাকে, ফিসক্যাল ডেফিসিট থাকে তখন আমরা জ্বালানির দামটা বাড়িয়ে দেব। সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারব। এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমাদের পলিসি। এই পলিসি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা একেক সময় একেক কথা বলছে। জ্বালানি উপদেষ্টা একবার বললেন, আমাদের গ্যাস অনেক আছে সুতরাং টাটাকে গ্যাস দিতে কোনো অসুবিধা নেই। আবার এখন বলছেন যে গ্যাস অনেক কম, সুতরাং কয়লাটা তাড়াতাড়ি ধরা দরকার। একই ব্যক্তি, একই ব্যক্তিবর্গ, একই ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কথা বলছেন। গ্যাস কম তাই কয়লা ধরা দরকার কারণ কয়লার ব্যাপারে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। আবার টাটা যেহেতু গ্যাসের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, তাকে গ্যাস দিতে হবে। সুতরাং গ্যাস দিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আসছে। বিদেশী বিনিয়োগ লাগবে বা বিদেশী বিনিয়োগ ছাড়া আমাদের উন্নয়ন হবে না- এরকম একটা মিথ তৈরি করা হচ্ছে। এবং বিদেশী বিনিয়োগের ফলাফল তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য সেক্টরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘাড় ঘোরানোর ব্যাপারটা কী সেটা বলে এখন আমি শেষ করব। ঘাড় ঘোরানো মানে হচ্ছে আমাদের যে জ্বালানি সম্পদ আছে, খনিজসম্পদ আছে, সেটাকে কী কাজে আমরা ব্যবহার করব তার প্রথম সূত্রপাত করা। প্রথমত, জ্বালানি নিরাপত্তার কাজে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পায়ন ইত্যাদি। এরপর আসবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ণয় এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির ব্যাপারটি। বাংলাদেশের সরকারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির বদলে যেগুলো ইতোমধ্যেই আছে, সেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা দক্ষ জনগোষ্ঠীকে খর্ব করছে কিংবা ধ্বংস করছে। ১৯৮২ সালে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, এনার্জি সেক্টরে বাপেক্স একটা অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং একে আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত করা দরকার। সেই নির্দেশনা অনুসারেই কাজ করা হয়েছে। বাপেক্স একটা পঙ্গু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পেট্রোবাংলার ৬০% পদ শূন্য। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন। একটা দক্ষ ও যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করার বদলে ধ্বংস করাটাই হচ্ছে বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রের নীতি। সেখানে যদি ঘাড়টা ঠিকমত ঘোরানো থাকে, তাহলে এই সম্পদটা

কবরস্থান কোনো সময়ই অধিগ্রহণ করা যাবে না। আমরা দেখছি এখানে কবরস্থান আছে। তো সেই জায়গার নিচে কয়লা খনিই থাকুক আর সোনার খনিই থাকুক, কারো মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে আমি সেটা তুলতে পারি না

গোলাম রব্বানী
বিচারপতি

আমাদের কাজে লাগবে। শিল্পায়নের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। সেই অনুযায়ী একটা প্রজেকশন প্ল্যান আমরা করতে পারি। দশ বছর, বিশ বছর, পঁচিশ বছর- যত বছর লাগে লাগুক, কোনো অসুবিধা নেই। যদি নিজেদের যোগ্যতা তৈরি না হয়, তাহলে সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতাও আমাদের নেই। সুতরাং এই সম্পদ যত দিন পর্যন্ত নিজেদের যোগ্যতায় আমরা তুলতে না পারব, তত দিন মাটির নিচে থাকুক। সাইফুর রহমান বললেও তো মাটির নিচে গ্যাস কিংবা কয়লা পচে যাচ্ছে না। সেটা যেখানে থাকার সেখানেই থাকছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে কয়লা উত্তোলনের জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানো আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। তার পরও যদি আমাদের প্রযুক্তিগত কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে আমরা চীন বা অস্ট্রেলিয়া থেকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসতে পারি এবং তাদেরকে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু কর্তৃত্ব অবশ্যই জনগণের হাতে থাকতে হবে এবং জনগণের সম্পদের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। আরেকটা কথা, আমরা যেটা ডকুমেন্টারিটাতে দেখলাম- একজন মহিলা বলছে, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি গণ্ডগোল করছে এবং মাঝখান থেকে বিদেশী কোম্পানি এসে দেশের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। মহিলার কাছে একটা খবর নেই যে, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে অনেক বিষয়েই মতবিরোধ এবং মারামারি থাকলেও এসব সম্পদ পাচার করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মারামারি নেই। বরং তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য আছে। এরকম অবস্থায় তারা একসঙ্গেই কাজ করে। ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ আনু মোহাম্মদ। আমাদের এই আলোচনায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত দেশের প্রধান দুটি দল বি.এন.পি এবং আওয়ামী লীগের কেউ উপস্থিত নেই। উপস্থিত নেই আরো কিছু মানুষ যারা সব সময় দেশের কথা বলেন। তারা কেন আসেননি সে ব্যাপারে জানাচ্ছেন সাপ্তাহিক ২০০০ এর সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা।

গোলাম মোর্তোজা : আজকের এই আলোচনায় আমরা দেখছি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতাদের কেউ-ই উপস্থিত নেই। তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিয়েছি যথাযথভাবে। আনেকেই আসতে চেয়েছেন। তবে তারা মাঝখানে একটা 'কিন্তু' দিয়ে রেখেছিলেন। তাদের অনেকেরই মূল বক্তব্য হচ্ছে কী হবে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে? এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির প্রায় সবাই এক রকম কথা বলেছেন। এবং দেখলাম যে আজকে তারা এই অনুষ্ঠানে আসেননি। আমরা এশিয়া এনার্জিকেও বলেছিলাম। এশিয়া এনার্জি বলেছে, আপনারা যাদেরকে আনবেন তারা তো আমাদের বিরোধী। ওখানে গিয়ে আমরা কী করব? আমরা বলেছিলাম আপনারা এসে আপনাদের বক্তব্যটা দেবেন। আপনারা যেসব কথাবার্তা বলছেন, যেসব তথ্য দিচ্ছেন সেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না। যারা আপনাদের বিরোধিতা করছেন, তারা যে ভুলভাবে আপনাদের বিরোধিতা করছেন, তাদের কথা যে ঠিক নয়, সেটাই আপনারা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তারপরও আপনারা আসেন।

ডঃ কামাল হোসেন আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ। এশিয়া এনার্জির ওয়েবসাইটে আমরা দেখি তাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে ড. কামাল হোসেন এন্ড অ্যাডভোকেটসের নাম রয়েছে। ডঃ কামাল হোসেন শুধু একজন আইনবিদ নন, তার পরিচিতি আরো অনেক বড়। দেশ এবং দেশের মানুষকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তা করেন। কিন্তু এশিয়া এনার্জির মতো একটা বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি কিভাবে কাজ করেন, সেটা নিয়েও অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। আমরা মনে করি কামাল হোসেনদের মতো মানুষদেরও দায়িত্ব রয়েছে জনগণের বিভ্রান্তি দূর করার। অথচ আমরা দাওয়াত দিলে তিনি গোল টেবিলে আসেন না।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : রেজওয়ানাকে ফ্লোর দিচ্ছি, কারণ নারী-পুরুষ ভারসাম্য ক্ষুন্ন হচ্ছে। অনকেক্ষণ ধরে ছেলেরাই শুধু কথা বলছে। ব্যালান্স আনার চেষ্টা করা যাক।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : আসলে আমার যেটুকু কাজের অভিজ্ঞতা, সেটা আইনজীবী হিসেবে। এনার্জি সেক্টরে অবভিয়াসলি আমার কোনো এক্সপার্টাইজ নেই। দু-একটা ক্ষেত্রে নাইকো বা অক্সিডেন্টাল কোনো অঘটন ঘটালে আইনকে তখন আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করি। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের ইস্যুতে কয়েকটা পয়েন্টে আমি কাজ করছি। সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব, তার আগে একটা জিনিস আমার একটু জানা প্রয়োজন। এখানকার কেউ যদি ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে বলেন, তাহলে খুব ভালো হয়। অনেকগুলো বিষয়েই আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। যেমন ফুলবাড়ী এলাকার লোকজনের কী হবে, পরিবেশের কী ক্ষতি হবে বা রয়ালটি ইস্যু ইত্যাদি। কিন্তু যে বিষয়টা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয় এবং আমি বিষয়টা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, তা হল এই যে এনার্জি সিকিউরিটির কথা বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে ২০১১ সালের পর আমাদের আর গ্যাস থাকবে না, তো এরপর আমরা কী করব? কোন দিকে যাব? আনু মোহাম্মদ সাহেবের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে যে আমরা আমাদের নিজেদের যে এজেন্সিগুলো আছে, তাদের দিয়ে এই কাজগুলো করাতে পারি। কিন্তু সেক্টরটা পাল্টালে কী হবে? শুধু কী কয়লার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করব, নাকি গ্যাস বা অন্য যে বিষয়গুলো আছে সেখানেও তাদেরকে ব্যবহারের চেষ্টা করব? এই একটা প্রশ্ন এখানে আসার পর আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

যে পাঁচটা পয়েন্টে আমি এশিয়া এনার্জি এবং ফুলবাড়ীর কয়লা বিষয়টিকে দেখতে চাই, তার একটা ইস্যু হচ্ছে পরিবেশ। আমরা পরিবেশগত ন্যায়বিচারের কথা বলে থাকি। কয়লানীতির পুরোটা আমি পড়িনি। পরিবেশ চ্যাপ্টারের যেটুকু পড়েছি, ওখানে লেখা আছে, 'লিজগ্রহীতা পরিবেশগত ন্যায়বিচারের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।' এটা খুবই অস্পষ্ট একটা কথা। পরিবেশগত ন্যায়বিচার বা এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস ব্যাপারটা কী? পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ধারণাটি বিকাশলাভ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর দুটো মূলমন্ত্র রয়েছে। একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ বা ফুল পার্টিসিপেশন, আরেকটা হচ্ছে 'ফেয়ার ট্রিটমেন্ট'। প্রথমটার অর্থ হচ্ছে পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন কোন সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন না, যাতে মানুষের অংশগ্রহণ নেই। এবং পরিবেশের পক্ষে যখন আপনি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন ফেয়ার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের কোনো একটা গোষ্ঠীকে সেই সিদ্ধান্তটা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। এশিয়া এনার্জির কর্মকাণ্ড নিয়ে যে বিতর্কগুলো চলছে তাতে দেখা যাচ্ছে পাবলিক পার্টিসিপেশন আসলে কিছুই হয়নি। যে ডকুমেন্টারিটা দেখানো হলো, সেখানেও

> **আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এশিয়া এনার্জি পৃথিবীর কোথাও ওপেন পিক মাইনিং করেনি। এসব ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্পোরেট ট্র্যাক রেকর্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া এনার্জির ট্র্যাক রেকর্ডে ওপেন পিক মাইনিং নাই**
>
>
>
> **এস কে আব্দুল্লাহ**
> সাবেক চেয়ারম্যান, পেট্রো বাংলা

আমার কথার প্রতিফলন আপনারা দেখেছেন। পত্র-পত্রিকার খবরেও উঠে এসেছে, ওখানকার মানুষ তদন্তে যাওয়া সরকারি কমিটিকে সাফ 'না' জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলোতে জনগণের কোন অংশগ্রহণ নেই। কোন পাবলিক পার্টিসিপেশন হয়নি। তাহলে পরিবেশগত ন্যায়বিচারটা কী? এটা কী কৃষির ব্যাপারে ন্যায়বিচার, মাটির ব্যাপারে ন্যায়বিচার, পানির ব্যাপারে ন্যায়বিচার, নাকি অন্য কিছু? কোন কোন ক্ষতিগুলো লিজগ্রহীতা পূরণ করে দেবে যেটাকে আমরা পরিবেশগত ন্যায়বিচার বলব?। একদিকে আমরা দেখছি পাবলিক পার্টিসিপেশন হয়নি, অন্যদিকে ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টে যে পরিবেশের উপর প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে পাবলিক পার্টিসিপেশন হয়েছে। এশিয়া এনার্জি দাবি করেছে। যদি সরকারি কমিটির মন্তব্য হয়ে থাকে পাবলিক পার্টিসিপেশন হয়নি আর রিপোর্টে ভিন্ন কথা থাকে, তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে এই রিপোর্টটা প্রতারণামূলকভাবে দাখিল করা হয়েছে? আমি এশিয়া এনার্জিকে টার্গেট করে বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের কোম্পানিগুলো তো এরকমই করে। অক্সিডেন্টালের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, পরিবেশের উপর প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এরকমই একটা আবছা আবছা বিষয় ছিল। নাইকোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবেশের উপর প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, তারপর আগুন লেগে গেছে। কেননা, পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্তগুলো মেনে চলা হয় না। উন্নত বিশ্বের কথা না হয় বাদই দিলাম, এই ভারত-শ্রীলঙ্কাতেও পরিবেশের উপর প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অংশগ্রহণের ব্যাপারটা কি রকম হবে সেসব দেশে, তার একটা পদ্ধতিও বলে দেয়া থাকে। আপনি মনে মনে পঞ্চাশটা লোককে ডাকলেই সেটা জনগণের অংশগ্রহণ হতে পারে না। এর জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে, জনগণ কেমনভাবে আপত্তি জানাবে সেটা বলে দিতে হবে, সেই আপত্তি কেমন করে বিশ্লেষণ করা হবে সেটা জানাতে হবে, তাকে 'ইয়েস' বললে কেন বলা হবে বা 'নো' বললে কেন বলা হবে এই সমস্ত বিষয় জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে থাকতে হবে। আমাদের এখানে তো আমি বলছি পাবলিক পার্টিসিপেশন হয় নাই, এশিয়া এনার্জি বলছে হয়েছে। এর মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ থাকছে। সুতরাং এই পদ্ধতিটা এবং এর ফলাফলটা আমার মনে হয় আইনগতভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত। কেননা, এটাও সত্য যে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিকে বিভিন্ন কাজে সংযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত সরকারকে অনেক সময়ই নিতে হয়। কয়লানীতিতে বলা আছে, 'দ্য লেসি শ্যাল শেয়ার দ্য ইনফরমেশন উইথ দ্য লোকাল পিপল'। এই কথাটা কয়লানীতিতে কিভাবে আসে? আরে, লীজগ্রহীতা তো ওর মতো করে ইনফরমেশন জেনারেট করে পরিস্থিতিতে নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটা নিরপেক্ষ তথ্যসূত্র। কেননা বিভিন্ন বিষয়ে মত বিরোধ হলে আমি বলব 'না', 'লীজগ্রহীতা' বলবে 'হ্যাঁ'। তাই, আমি সরকারকে বলব যে দেখো এটা জনগণের সম্পত্তি, আমি একটা নিরপেক্ষ তথ্যসূত্র দিচ্ছি, তুমি এটা দেখো, বিশ্লেষণ কর এবং তোমার মতামত দাও। লীজগ্রহীতা কেন তথ্য দেবে? সে কেন পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে? কে বলবে যে লীজগ্রহীতা পরিবেশগত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেছে কি করেনি? পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা হিসাব করতে হবে। কিসের ভিত্তিতে লীজগ্রহীতা পরিবেশের ক্ষতি নিরুপণ করবে? আমাদের দেশে কি কোনো আইন আছে, যার ভিত্তিতে লীজগ্রহীতা পরিবেশগত ন্যায়বিচার হল কি হল না বা তার পরিমাণ নিরুপণ করবে? পরিবেশের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান আছে। আমাদের দেশ কি সেগুলো গ্রহণ করেছে? নাকি এমনিতেই লীজগ্রহীতাকে তাদের প্রজ্ঞা ব্যবহারের একতরফা ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে? আরেকটা ব্যাপার দেখুন, একটা জায়গায় যারা ৫০ বা ১০০ বছর ধরে আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করে শুধু সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিলেই হয় না। তাদেরকে এমনভাবে পুনর্বাসিত করা দরকার যেন পূর্বে তাদের জীবনযাত্রার যে মান ছিল এবং ক্ষতি পূরণের পর যে মান হবে তা সমান হয়। তাই পুনর্বাসন ব্যাপারটা কি সরকারকে তা নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। আপনারা জানেন পাশাপাশি এলাকায়-যমুনা ব্রিজ প্রকল্পে যমুনা যে জমির দাম দিয়েছে ৯ হাজার ফ্যাপ সেখানে দাম দিয়েছে ৮০০ টাকা। সেই কারণে জমির প্রকৃত মূল্য কি সেটা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এটা কী লীজগ্রহীতা নির্ধারণ করে দেবে নাকি সরকারের কোন বোর্ড এটা নির্ধারণ করবে? তর্কের খাতিরে আমি এশিয়া এনার্জির কথাই মেনে নিলাম যে ৫০ হাজার লোককে পুনর্বাসিত করতে হবে। আপনি যখন শুনেন যে আপনার বাসায় ৫টা ইঁদুর হাঁটাহাঁটি করে তখন আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। সেখানে ৫টি লোক দেশের কোনো অঞ্চলে নতুন করে পুনর্বাসিত করা হবে? ৫০ হাজার লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। যদি করা হয় তাহলে আমাকে বল যে এখানে তাদের পুনর্বাসিত করা হবে। লোকজনকে বল যে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে আমি এখানে বসাচ্ছি। এখানে স্কুল থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, কলেজ থাকবে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তারা না হয় কিছু ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেবে। কিন্তু সেটা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। আমার সব সময় মনে হয় যে আমাদের একটা জরুরী তহবিল থাকা দরকার। এটা আমার মনে হলো যখন আমি ভারতের একটা মামলার রায় পড়ছিলাম, ভূপাল দুর্ঘটনার পরে। ভারতের আদালত তখন সরকারকে একটা জরুরী তহবিল করতে পারার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেছিল। আমাদেরও ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত। তহবিলটা থাকলে নাইকোর মত যদি কেউ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে যায়, তাহলে আমরা যেন সেখান থেকে কিছু জনগণের সাহায্যার্থে দ্রুত ব্যয় করতে পারি। অথচ দেখা যায় আমরা যখন নাইকোর ব্যাংক একাউন্ট সিজ করবার জন্য আদালতের আদেশ প্রার্থনা করি, তখন এটর্নি জেনারেল এর অফিস থেকে, নাইকোকে সাপোর্ট দেয়া হয়, ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজের আদেশটা যেন তুলে নেয়া হয়। আরেকটা কথা যেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, সেটা হলো কোম্পানিগুলোর করপোরেট ট্র্যাক রেকড। নাইকোর ট্যাক রেকর্ড যেমন সম্পূর্ণ শুন্য। আমরা কানাডায় আমাদের পরিবেশ আন্দোলনের সহকর্মী বন্ধুদের যখন বললাম যে ভাই একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো এরা কারা, ওরা বলল, আমাদের যে এজেন্সি আছে, তেল-গ্যাস নিয়ে যারা ডিল করে, তাদের কাছে ওদের কোনো ফাইলই নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই তারাই আমাদের দেশে এসে কাজ করে। আমরা জানি হাইকোর্ট নাইকোকে নির্দেশ দিয়েছিল শেয়ার হোল্ডারদের নাম প্রকাশ করতে। তাদের নাম কিন্তু এখনো প্রকাশ করা হয়নি। আমার মনে হয় কর্পোরেট ট্র্যাক রেকর্ডও একটা জিনিস

কয়লানীতিটা আসলে কথার কথা। কয়লানীতির মূল কথা হচ্ছে যেভাবেই হোক ওদেরকে কয়লা দিতে হবে। ভয়াবহ কথা হচ্ছে কয়লার ৮০ শতাংশ চলে যাবে বিদেশে

আমানুল ইসলাম চৌধুরী
সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

যেটা আমাদের কোল পলিসিতে আসা উচিত। সেটা এসেছে। তবে খুবই আবছাভাবে। সেটা এদিকেও যাচ্ছে না। এদিকে যাচ্ছে না। আমি কোম্পানীগুলোর কর্পোরেট ট্র্যাক রেকর্ড এবং শেয়ার হোল্ডারদের নাম জানতে চাই। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি রেজিস্টারের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। ওখান থেকে আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এগুলোর কাগজ আপনি পাবেন না। ধন্যবাদ।

এস. কে. আব্দুল্লাহ : প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. শামসুল আলমকে। এশিয়া এনার্জি যে কতগুলো মিথ্যা কথা বলছে, সেগুলো উনি তুলে ধরেছেন। ওরা বলছে অস্ট্রেলিয়ার মতোই এ দেশের ভূ-তাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থা বিদ্যমান। এটা একটা মিথ্যা কথা। আমি অস্ট্রেলিয়াতে অন্তত সাতটা ওপেন পিক মাইন ভিজিট করেছি। সেগুলোর প্রত্যেকটাই মরুভূমিতে। ইন্দোনেশিয়ায় মাইনিং করা হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এশিয়া এনার্জি পৃথিবীর কোথাও ওপেন পিক মাইনিং করেনি। এসব ক্ষেত্রে কোম্পানির ট্র্যাক রেকর্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া এনার্জির ট্র্যাক রেকর্ডে ওপেন পিক মাইনিং নাই। আরো কতগুলো মিথ্যা কথা তারা বলছে, যেমন প্রথম দশ বছরে ১৫/২০ হাজার এবং পরে আরো ৫০ হাজারের মতো মানুষ সরাতে হবে। এটা মিথ্যা কথা। এটা আস্তে আস্তে সরালে হবে না। আমাদের যে জিওলজিক্যাল সিচ্যুয়েশন, তাতে একবারে ৫০ হাজার লোককে সরাতে হবে। আমাদের কথা হচ্ছে এই ৫০ হাজার লোককে পুনর্বাসিত করার মতো জায়গা কাছাকাছি কোনখানে নেই। রেজওয়ানা আরেকটা কথা বলেছেন, যাদেরকে পুনর্বাসিত করা হবে, তাদের জীবনযাত্রার মান অনুসারেই পুনর্বাসিত করতে হবে। আমিও তার সঙ্গে একমত। একটা লোক এখন যে অবস্থায় আছে, যেভাবে জীবনযাপন করছে, সেভাবেই তাকে পুনর্বাসিত করতে হবে। কম করলে চলবে না। পরিবেশের ওপর প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারা তৈরী করেছে আমি জানি না। বাংলাদেশী কোম্পানি 'বিটস' নাকি একটা সার্ভে করেছে। তাতে ১৫/২০ হাজার লোকের সবাই নাকি বলেছে, তারা খুশি। আমার প্রশ্ন হলো সবাই যদি খুশি হয়, তাহলে আমাদের পালিয়ে আসতে হলো কেন? ওখানকার লোকজন এশিয়া এনার্জির ওপর এতোই ক্ষ্যাপা যে ওখানে নতুন কেউ পৌঁছানোর আগেই মানুষজন সাবধান করে দেয়। না না, ওখানে যাওয়া যাবে না। ওখানে গেলে জীবনের ভয় আছে। অর্থাৎ ওখানে কেউই এই মাইনিং-এ রাজি না। বিচারপতি রাব্বানী বললেন- মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান ইত্যাদি ভূমি অধিগ্রহণ আইনে অধিগ্রহণ করা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কখনো এই আইন মানা হয়। ভূপালের পরে সারা পৃথিবীতে সকল কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে একটা অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটা এই কারণে

লক্ষাধিক মানুষ হারাবে বাস্তুভিটা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে শুরু করে সবুজ জমি পর্যন্ত সবকিছু প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। তারপর যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে সে অনুসারে প্রায় ৭৫% কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হবে। এই কয়লা রপ্তানি হলে কী বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বড়বে? এর সোজা জবাব হচ্ছে, বাড়বে না

আনু মোহাম্মদ
অর্থনীতিবিদ

করা হয় যেন কোম্পানির কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার যেখানে সেখানকার পরিবেশ আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে পেট্রোলিয়াম সেক্টরে যে চুক্তি হয় তাতে এই অনুচ্ছেদটা থাকে। এ ধরনের একটা অনুচ্ছেদ চুক্তিতে রাখার জন্য আমরা বহুবার বিলিয়ার তরফ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেছি, তারা আমাদের কথা শোনেনি। ফুলবাড়ী সম্পর্কে আমাদের বেসিক বক্তব্য এটাই যে ৫০ হাজার লোককে জায়গা দেওয়ার মত জায়গা আমাদের নেই। আমরা এদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসিত করতে পারবো না। তাছাড়া ৩০-৪০ বছরে যে বিরাট এলাকায় ফসল হতো, সেটাও হবে না। সেটাও আমাদের লস। আগে ধারণা ছিল রয়ালিটি ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হবে। ৫ শতাংশ রয়ালিটি যখন ধরা হয়েছিল, তখন কয়লার দাম ছিল ২৭ ডলার। এখন কয়লার দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ ডলার। এমতাবস্থায় এই রয়ালিটিতে বাংলাদেশ সরকারের লস হবে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। লাভ তো দূরের কথা। অতএব এই প্রজেক্ট কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান : ধন্যবাদ। এবারে বলবেন আমানুল ইসলাম চৌধুরী।

আমানুল ইসলাম চৌধুরী : ওপেন পিক পদ্ধতিতে, আমাদের মতো জনবহুল দেশে মাইনিং করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তাই আলোচনা করারও কোনো অবকাশ নেই। এটা করলে আসলে আমরা ধ্বংসের দিকে এগুবো। দেশে অনেক মিথ্যাবাদী আছে। মিথ্যাবাদীরা বলে ১৫-২০ বছর চলার মতো গ্যাস আমাদের আছে, তাই এটা টাটাকে দিয়ে দেয়া যায়। আবার আজকে কয়লার পেছনে লাগার জন্য তারা বলছে, ১০ বছর বা ৫ বছর চলার মতো গ্যাস আছে। আসলে তাদের কথার কোনো দাম নেই। জাতিগতভাবে আমাদের স্মরণশক্তি খুব কম। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইস্ট ইন্ডিয়ার কথা ভুলে যাই। খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই '৫২ সালের কথা। ভুলে যাই '৭১ সালের কথা। এ কারণেই তারা এসব কথা বলার সাহস পায় এবং আমাদেরকে ভুল বোঝাতে পারে। আজকে গ্যাস শেষ করে তারা কয়লার পেছনে লেগেছে। আপনারা কয়লানীতির কথা বলেছেন। আমি আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিসরে যা বুঝি সেটা হচ্ছে কয়লানীতিটা আসলে কথার কথা। কয়লানীতির মূল কথা হচ্ছে যেভাবেই হোক ওদেরকে কয়লা দিতে হবে। ভয়াবহ কথা হচ্ছে কয়লার ৮০ শতাংশ চলে যাবে বিদেশে। তাহলে আমরা কী পাব? উত্তর হলো আমরা কিছুই পাব না। আমি আনু মোহাম্মদের কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। মহাজ্ঞানী, মহাগুণী যে যত যাই বলে বলুক না কেন, কারো কথা শুনে আমরা আর আমাদের নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নষ্ট করতে রাজি নই। যতদিন না আমাদের নিজেদের সামর্থ্য তৈরি হচ্ছে, ততদিন আমাদের তেল-গ্যাস আমাদের মাটিতেই থাকবে, আমরা যেদিন নিজেরা তুলতে পারব, সেদিনই শুধু আমরা কয়লার দিকে হাত বাড়াব, তার আগে নয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ : ধন্যবাদ। এবারে শহীদুল্লাহ সাহেব।

শেখ মো: শহিদুল্লাহ : ড. শামসুল আলম যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার কয়েকটা জায়গায় বেশ বড় বড় ভুল রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন আমরা মাত্র ৬৭ কেজিওই জ্বালানি ব্যবহার করি, তার কারণ হচ্ছে বাণিজ্যিক জ্বালানির উৎস অপ্রতুল এবং তা অধিকাংশ মানুষেরই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এটা মোটেই সত্য নয়। আসলে জ্বালানি তাদেরকে দেয়া হয় না। গ্যাসের তুলনায় কাঠের লাকড়ি আরো বেশি ব্যয়বহুল। মানুষ জ্বালানী পায় না সেটা তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে বলে নয়, আসলে সরকার তাদের দেয় না। একটা জিনিস কেউ বলছেন না। এখানে যদি এশিয়া এনার্জিকে ওপেন কাস্ট মাইনিং পদ্ধতিতে খনি খনন করতে দেয়াই হয়, তাহলে তারা এটা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে তাদের ক্ষতিও হবে না। তারা শেয়ার মার্কেট

ভ্যালু বের করে লাভবান হবে। ওখানে ওপেন কাস্ট মাইনিং সম্ভবই নয়। তা কি ওরা বোঝে না। বা জানে না? জানে, কিন্তু তবু তারা এটা করতে চাচ্ছে তাদের ব্যবসায়িক পলিসির জন্য। আরেকটা জিনিস বলেই শেষ করব। আমাদের দেশে অনেক ধনী আছেন, যাদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু টাকাটা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা হয় না। আমরা যদি শুধু প্রবাসীদের টাকা নিয়েই দেশের এই সমস্ত খাতে বিনিয়োগ করি, তাহলে এই সব বাইরের বিনিয়োগ বন্ধ করা সম্ভব। আনু ভাইয়ের কথাটাকেই আমি আবার তুলে ধরতে চাই। বাপেক্সকে ধ্বংস করা হয়েছে, পঙ্গু করা হয়েছে দুর্নীতি, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির মাধ্যমে। ওখানে যে দক্ষ জনশক্তি ছিল, সেটাকেও ধ্বংস করা হয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং না দিয়ে। এটা করা হয়েছে খুবই পরিকল্পিতভাবে। যেন দেশে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠতে না পারে এবং বিদেশীরা এসে দেশের সম্পদ সব লুটে নিয়ে যেতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ শহীদুল্লাহ সাহেব। এবারে আসিফ নজরুল।

ড. আসিফ নজরুল : ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. শামসুল আলমকে। ধন্যবাদ ২০০০কে। প্রথমে বিশাল একটা থ্যাঙ্কস দেয়া দরকার গোলাম মোর্তোজাকে। যিনি আমাদের কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন যে, ড. কামাল হোসেন এশিয়া এনার্জির অন্যতম ল' রিটেইনার। আমি মনে করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য, এটার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও মনে করি যে, তথ্যটা কালকের অধিকাংশ পত্রিকাতে আমরা দেখব না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে নাইকো বলেন, অক্সিডেন্টাল বলেন বা এশিয়া এনার্জি বলেন, এদের ল' রিটেইনার হিসেবে যারা কাজ করে, তারা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যারা মানবাধিকার নিয়ে বড় বড় কথা বলে। যেমন রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার মওদুদ কিংবা ড. কামাল হোসেন, এরা। এবং আমি কিছুদিন আগে একটা তথ্য পেয়েছি- সেটা হচ্ছে এদের যে লিগ্যাল ফি দেয়া হয়, সেটা এ বছরের জন্য একধাপে সাড়ে ৭ গুণ বাড়ানো হয়েছে। এটা আমাকে প্রথম আলোর এনার্জি রিপোর্টার বলেছে। আমার নিজের কাছে মনে হয় আমরা অনেক সময় অনেক অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করি। এর আগেও সাপ্তাহিক ২০০০ অনেক কনফারেন্স করেছে এবং আমরা অনেক অস্পষ্টতা নিয়ে অনেক কিছুর সমালোচনা করেছি। আসলে কত টাকা ইনভেস্ট হয়েছে, কতটুকু কয়লা উত্তোলন হবে, এসব বিষয়ে কোনোভাবেই আমরা পরিষ্কার কোনো তথ্য পাই না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই দায়িত্বটা আসলে কার? এই দায়িত্বটা তো হওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর, সংসদের। সংসদে ওপেন ফ্লোর রয়েছে। স্পেশাল পার্লামেন্টারি কমিটি রয়েছে। এই কমিটিতে প্রতিটি জিনিস আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। আমরা বিরোধী দলগুলোকে প্রায়ই বলতে শুনি সংসদে তারা যায় না কথা বলতে পারে না দেখে। কিন্তু যখন তারা যায় বা কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায়, তখন তারা তাদের মৃত এবং সাবেক নেতা কী কী করেছেন, এবং অন্যদলের নেতা কী কী অপকর্ম করেছেন, এইসব পুরানো কথা বারবার বলতে থাকে। কখনো তাদেরকে জনগুরুসম্পন্ন কথা বলতে শুনি না।

আমরা খুব খুশি হতাম যদি এখানে বিরোধী দলের বা সরকারি দলের কেউ থাকত। সংসদে তাদের জনগণ পাঠিয়েছে কেন? এই গুরুত্বপুর্ণ ইস্যুগুলোতে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য। এগুলো নিরীক্ষণ করার জন্য। সংসদে একজন সাংসদের তথ্য পাওয়ার যে সুযোগটা আছে অন্য কারো তা নেই। এমন কী ড. খলীকুজ্জামানের মতো এতো বড় একজন বিশেষজ্ঞেরও নেই। আমাদের একটা মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে, আমাদের তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত কোন আইন নেই। আমরা যে যে তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলি, সেগুলোর আগে বাধ্য হয়েই অনেকগুলো যদি/কিন্তু লাগাতে হয়। দুইটা মূল জিনিসের অভাব নিয়েই আমাদের পর্যবেক্ষকের কাজটা করতে হয়। একটা হচ্ছে সংসদের নিষ্ক্রিয়তা। অন্যটা হল, আমাদের তথ্য জানার অধিকার নেই। আমার মনে হয় এ ব্যাপারেও আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত। এবং এক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সোসাইটির যে মুভমেন্টটা তাতে, আমরা বিকল্প উপায়ে কী করতে পারি, সেটাও ভাবা দরকার। এর আগে আমি বলেছিলাম একটা ওয়েব সাইট করেন যেখানে সমস্ত তথ্য থাকবে। ওয়েব সাইটটা সম্পর্কে সবাইকে তথ্য দেন। এটার কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে দেন। দৈনিক পত্রিকাগুলো এগুলো ছাপাক। তারা বলুক যে এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, আপনারা অংশগ্রহণ করুন।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ করে গত কয়েক দিন আগে এনার্জি জার্নালিস্ট ফোরাম গঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তেল গ্যাস কোম্পানিগুলোর এ সংক্রান্ত বাজেটও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা সাংবাদিকদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। এগুলো কোনো সমস্যা না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একটা বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির টাকায় যখন একজন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ নিতে কানাডায় বা অন্য কোথাও যায়, ফিরে এসে সেই সাংবাদিকের পক্ষে তখন আর ঐ কোম্পানির

এই রিপোর্ট ধরেই নিচ্ছে ৬% রয়েলটির বেশি কেউ দেবে না। ৬%-এর বেশি অন্যকেউ দেবে না এটা আমরা জানলাম কীভাবে? আমরা কী ওপেন টেন্ডারিং করেছি? আমরা কী পৃথিবীর অন্যসব জায়গায় বলেছি যে আমরা খনি খনন করতে চাই, এই এই শর্তে

অধ্যাপক এমএম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে যদি এশিয়া এনার্জিকে ওপেন কাস্ট মাইনিং পদ্ধতিতে খনি খনন করতে দেয়াই হয়, তাহলে তারা এটা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে তাদের ক্ষতিও হবে না। তারা শেয়ার মার্কেট ভ্যালু বের করে লাভবান হবে

শেখ মো: শহিদুল্লাহ
প্রকৌশলী

বিরুদ্ধে লেখা সম্ভব হয় না। আমাদের প্রেসক্লাবের কোড অব কনডাক্টে এ ধরণের কোনো বিধি নিষেধ নাই। দুর্নীতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। টাকা দিলাম না, কিন্তু কাউকে যদি আমেরিকায় ঘুরতে পাঠানো হয়, সেটাও তো এক ধরনের ঘুষ। এই ব্যাপারে আমাদের প্রেস কাউন্সিলের গাইড লাইনে নির্দেশনা থাকা উচিত। প্রথম আলোসহ অন্য কোনো পত্রিকাতেও এ ধরনের ছদ্ম উপহার নেওয়ার ব্যাপারে কোনো গাইড লাইন নাই। সাংবাদিকরা আমাদের 'ওয়াচডগ'। তারা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা জানি পত্রিকার মালিক পর্যায়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রভাব রয়েছে। কারণ তারা একই উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত। সাংবাদিক পর্যায়েও যদি এই ধরনের প্রবণতা শুরু হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এই ইস্যুগুলো রেইজ করা দরকার। বিভিন্ন পত্রিকাকে বলা দরকার আপনারা আপনাদের কোড অব কনডাক্টট ডেভেলপ করেন। এনার্জি সেক্টরে যারা সাংবাদিকতা করছে, তাদের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কোড অব কন্ডাক্ট কি হবে সেটা নির্ধারণ করুন। বাংলাদেশের মতো দেশে যদি কোনো এনার্জি উৎস পাওয়া যায়, তাহলে তার ব্যবহারের প্রশ্নটি উঠবেই। একটা বিদেশী কোম্পানি যখন সেটা উত্তোলন করতে আসবে তখন সে তার স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবেই। আমাদের যে আইনগুলো রয়েছে তাতে কি কি ফাক ফোকর আছে রেজওয়ানা তা খুব ভালোভাবে বলেছে। এনার্জি কনজারভেশন আইনে অনেক ধরনের স্টাডি করার কথা বলা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে এই স্টাডিগুলো একটা বিদেশী কোম্পানির পক্ষে করা কঠিন না। তারা বাংলাদেশের বেস্ট এক্সপার্টদের দিয়েই এই স্টাডিটা করাবে। এই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক জড়িত থাকে তাদের নির্দেশেই ডিওই কাজ করে। নিরপেক্ষভাবে এই স্টাডিগুলো করতে পারার সামর্থ্য, ইচ্ছা, সাহস কোনটাই পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই। আর যে স্টাডিগুলো হচ্ছে সেগুলো মূল্যায়ন করার কোন সুযোগ আমাদের নেই কারণ সেগুলো আমাদের দেওয়া হয় না। এ জন্যই সৎ শাসন বা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণ করা প্রয়োজন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ ড. আসিফ নজরুল। আপনি ওয়েব সাইটের কথা বলেছেন , আমরা ইতিমধ্যেই একটা ওয়েবসাইট চালু করেছি। সাইটটার নাম www.energybangladesh.org। আপনাদের যদি কোনো তথ্য দেওয়ার থাকে, শেয়ার করার থাকে তাহলে গোলাম মোর্তোজার সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এবার বলবে এম এম আকাশ

এম এম আকাশ : আমি প্রথমে একটা খুব সিলি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই। কয়লা উঠাবো কি জন্য? আমার দেশের কাজে লাগবে এই জন্য তো? এই যে একটা তত্ত্ব বলা হল যে আমেরিকা, চীন, ভারত খুব অল্প পরিমাণ কয়লা ওঠাচ্ছে, সেটা কেন? আমেরিকাতো ইচ্ছা করলেই সবটুকু কয়লা ওঠাতে পারে। কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে কয়লা ওঠাচ্ছে। আমাদের আগে চিন্তা করতে হবে কেন আমরা কয়লা উঠাতে চাই। এটার উত্তর হচ্ছে- আমার যে জ্বালানি নিরাপত্তা এটা দীর্ঘ মেয়াদে আমি সংরক্ষণ করতে চাই। এই পলিসিটা আগে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এটা যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? এই কোল পলিসিটার কথাই যদি ধরি এখানে যে ডাটা দেওয়া আছে সেই ডাটা অনুযায়ী আমাদের নবেম্বর ২০০৫-এ গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১৩.৭৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট। এটা ২০১১ সালে শেষ হয়ে যাবে। এরা আরো বলছে এখন থেকে যদি ২০১৫ পর্যন্ত আমাদের জিডিপির গ্রোথ রেইট ৫.৫% থেকে ৫.৭ পর্যন্ত ভ্যারি করে , তাহলে আমাদের এই গ্যাস ফুরিয়ে যাবার পরও ১৬ টিসিএফ থেকে ২৬ টিসিএফ গ্যাস লাগবে। যেটা আমাদের নাই। কারণ এই যে ১৩.৭৫ টিসিএফ এটা হচ্ছে প্রুভেন এবং প্রবাবল গ্যাস মজুদ। শুধু প্রুভেন না। প্রুভেন প্লাস প্রোবাবল, যেটা আমরা পরে পেতে পারি সেটা সহ। সুতরাং এই যে বাড়তি চাহিদা এটা আমরা কোথা থেকে সংগ্রহ করব? এটা সংগ্রহ করতে হবে কয়লা থেকে। তাহলে কয়লা তো আমাদের লাগবেই। কয়লা আমাদের আছে কত? যদি ধরা যায় ১৪০০ মিলিয়ন টন কয়লা আছে, এটা ৩৭ টিসিএফ গ্যাসের সমপরিমাণ। তাহলে এর মধ্যে ২০ টিসিএফ তো আমাদের দেশেই লাগবে। ৭৫% আর রপ্তানি করব কিভাবে? কেনই বা রপ্তানি করব? এই পলিসিই তো আমাকে সেটা রপ্তানি করতে দিতে বারণ করছে। তারপর তো পরিবেশের কথা আছে, পুনর্বাসনের কথা আছে। ওরা চালাক তো, তাই বলেছে, আমরা চুক্তিটা একটু রিভাইজ করব। রিভাইজ করে শর্ত দেব একটন যদি রপ্তানি করে তাহলে একটন ডোমেস্টিক প্রডাকশনে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ কয়লার অর্ধেক যদি ডোমেস্টিক প্রডাকশনে ব্যবহার করতে দেয় তাহলেই আমরা চুক্তিটা করব। এটাতে এশিয়া এনার্জি এখনও কিন্তু রাজী হয়নি। ধরা যাক ওরা রাজী হল, তখন ওরা বলতে পারবে, আমরা তো তোমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করলাম। এখন আসুন দেখি এই চুক্তিতে আমার লাভ কত, ওর লাভ কত? এখানে দেখা যাচ্ছে এই রিপোর্ট ধরেই নিচ্ছে ৬% রয়েলটির বেশি কেউ দেবে না। ৬%-এর বেশি অন্যকেউ দেবে না এটা আমরা জানলাম কীভাবে? আমরা কী ওপেন টেন্ডারিং করেছি? আমরা কী পৃথিবীর অন্যসব জায়গায় বলেছি যে আমরা এরকম করতে চাই, এই এই শর্তে! যারা যারা আগ্রহী দরপত্র দাখিল কর। তা তো আমরা করিনি। সেক্ষেত্রে আমরা তো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই রিপোর্টটা পূর্ব পরিকল্পিত। আরেকটা জিনিস হল এই ৬% রয়ালটির ব্যাপারটা এসেছে এশিয়া এনার্জির প্রস্তাব থেকে। শুধুমাত্র এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে একটা দেশ কীভাবে তাদের জাতীয় নীতি প্রস্তুত করে? এর পরের যে ব্যাপারটা সেটা হল এই কয়লা তো মংলা বন্দরের মধ্য দিয়ে এক্সপোর্ট করতে হবে। তাহলে মংলা বন্দরেও একটা ইনফ্রা স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হবে। এই ইনফ্রা স্ট্রাকচারটা কে তৈরি করে দেবে? ওটার ব্যয় কে বহন করবে? এশিয়া এনার্জির প্রপোজাল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ঋণ দেবে। তাহলে আমার কথা হচ্ছে কস্টের মধ্যে ঐ ঋণের বোঝা এবং ঐ ঋণের সুদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পরিবেশের ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আমাদের ৬% রয়ালটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এরপর আমি যে রিটার্ন পাব সেটা এবং কস্ট মিলিয়ে দেখতে হবে এটা আমার জন্য কতখানি লাভজনক। তাতে দেখা যায় এই প্রজেক্ট কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

> পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন কোন সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন না, যাতে মানুষের অংশগ্রহণ নেই। এবং পরিবেশের পক্ষে যখন আপনি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন ফেয়ার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের কোনো একটা গোষ্ঠীকে সেই সিদ্ধান্তটা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না
>
> **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**
> পরিচালক কর্মসূচি, বেলা

নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল : আকাশ সাহেব আমি আপনার কথার সঙ্গে আরেকটু যোগ করি। আপনি যে বললেন, প্রস্তাবিত চুক্তিতে বলা হয়েছে একটন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করলে একটন দেশের ব্যবহারের জন্য দিতে হবে, এটা কিন্তু মাত্র প্রথম দশ বছরের জন্য। এর পরের অংশে বলা হয়েছে প্রথম দশ বছর পরে দুইটন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করলে একটন বাংলাদেশকে দিতে হবে। অর্থাৎ তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে রপ্তানিঃদেশীয় ব্যবহার=২ঃ১।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ জনাব এম এম আকাশ। এবার বলবেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর বাসিন্দা জনাব আমিনুল ইসলাম।

আমিনুল ইসলাম : ফুলবাড়ি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে ফুলবাড়ির যে সম্পদ সেটা শুধু ফুলবাড়ির সম্পদ নয় সেটা পুরো বাংলাদেশের সম্পদ। স্থানীয় মানুষ হিসেবে আমাদের বক্তব্য হল আমরা এই খনি চাই না। কিন্তু এশিয়া এনার্জির রিপোর্টে আমরা দেখছি যে তারা বলছে স্থানীয় মানুষজন নাকি ব্যাপারটাকে সাপোর্ট দিয়েছে। এশিয়া এনার্জি যতগুলো রিপোর্ট করেছে সব মিথ্যাতে ভরা। মিথ্যা কেমন- সেদিন যে তদন্ত কমিটি ওখানে গেল, সেখানে ওরা ৩২ জনকে জিজ্ঞেস করেছে। তার মধ্যে একজন বাদে সকলেই বলেছে যে আমরা কয়লাখনি চাই না। দশ হাজারেরও অধিক মানুষ মাইকিং নেই কিছু নেই, বড় পুকুরিয়া রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিল। তারা স্লোগান দিচ্ছে-না আমরা খনি চাই না। ফুলবাড়ীর মানুষ ওপেন মাইনিং চায় না। মানুষ সেখানে যে রকমভাবে আছে, সেখানে সেরকমভাবে থাকতে চায়। এশিয়া এনার্জি এখন ফুলবাড়ীতে অবস্থান করছে শীতের ধোয়া তুলে। তারা শীত বস্ত্র দিচ্ছে, আরো বিভিন্নভাবে তারা মানুষ কেনা বেচার চেষ্টা করছে। ওরা ওখানে অবস্থান করে নেতাদের কিনতে চাচ্ছে। জনগণ তো কখনো বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় নেতৃবৃন্দ। জনগণ চায় না এশিয়া এনার্জির লোকজন ওখানে থাকুক। ওরা ওখানে অবস্থান করলে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাতৃত্ব থাকবে না। সামাজিক পরিবেশ বজায় থাকবে না। এবং ওখানকার মানুষদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে। খনি এলাকার বাইরের মানুষদেরকেও তারা কেনার চেষ্টা করছে। কেননা তাদের কেনা সহজ। ফুলবাড়ী থেকে এশিয়া এনার্জিকে কীভাবে খেদানো যায়, সেই পরামর্শ চেয়ে এবং আদৌও বাংলাদেশে ওপেন পিক মাইনিং সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নটি সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ফুলবাড়ীর মানুষের পাশে থাকার জন্য সুশীল সমাজের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য আসলে আমাদের গ্যাসের ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। তথ্যগুলো সঠিক বলতে হবে। ১০০ ট্রিলিয়ন টিসিএফ গ্যাস আছে এভাবে বলা যাবে না। যেটা আছে, সেটাই বলতে হবে। একই কথা কয়লার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কয়লা রপ্তানি করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা করতে পারলে ভালো। তবে কেন রপ্তানী করব সেটা আগে বিচার করতে হবে। আমাদের সম্পদ খুব কম। মাটি আছে, পানি আছে, আর এই কয়েকটি জিনিস যেমন কয়লা আছে, গ্যাস আছে। এগুলোর সুব্যবহার যদি আমরা মানুষের স্বার্থে নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে কোনো লাভ নেই। যে পলিসিগুলো করা হচ্ছে, সেগুলো করা হচ্ছে কিছু মানুষের স্বার্থে। আগে-পিছে বিবেচনা না করে যদি বলা হয় এই জিনিসগুলো আমরা রপ্তানি করব, তাহলে মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। বাংলাদেশের এনার্জি নিরাপত্তাও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এনার্জি নিরাপত্তা নিশ্চিত না করতে পারলে দেশের উন্নয়ন থেমে যাবে। এখন এনার্জির অবস্থা কি তা তো আপনারা জানেনই। শহরে যারা আছি তাদের অবস্থা একটু ভালো। গ্রাম থেকে এনার্জি ডাইভার্ট করে আনা হয়। গ্রামে এই শুরু হল দশ মিনিট পরেই নাই। পাম্প চালানো হল, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। পাম্প বন্ধ। তারপর অনেকক্ষণ ধরে লোড শেডিং হয়। কারণ আমাদের উৎপাদন সীমিত। অনেকগুলো বিদ্যুতের প্লান্ট বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যাস দ্বারা উৎপাদিত হয় ৯০% বিদ্যুত। কাজেই গ্যাস যদি আমরা রপ্তানি করা শুরু করি তাহলে কয়েক বছর পরেই আমাদের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। দেশ অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন আমাদের প্রয়োজন মেটাতে বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করা লাগবে। অতএব দেখা যাচ্ছে গ্যাস বিদ্যুৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এনার্জির অন্যান্য উৎসের সঙ্গেও সম্পর্কিত। কিন্তু আমাদের দেশে এনার্জির অন্যান্য উৎস খুব বেশি একটা নেই। আরেকটি অপশন হল জল বিদ্যুৎ আমদানি করা। সেটা একটা কঠিন ব্যাপার, সেটার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা দরকার। এক্ষেত্রে অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে যাচ্ছে। নেপাল এবং ভারত একযোগে কাজ করছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে। বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল এবং আছে, এবং গঙ্গা চুক্তিতে পরিষ্কার করে বলা আছে যে অভিন্ন নদীগুলোতে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন কারো ক্ষতি না হয় এবং সবাই যেন তাদের ন্যায্য অংশ পায়। কিন্তু আমরা অভিন্ন নদীতে ভারত নেপালের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি। কাজেই আমাদেরকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন আমরা পিছিয়ে না পড়ি। তার জন্য শুধু কয়লানীতি না, প্রয়োজনে পুরো জ্বালানি নীতিতেই সংশোধনী আনতে হবে।

আমাদের তেল-গ্যাস-কয়লা যে কমিশন আশা করছি হয়তো আমরা এর ওপর একটা কমপ্রিহেনসিভ পলিসি দিতে পারব। সবাই আমরা ব্যস্ত। তবুও আমরা সেই আশা করছি এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির পক্ষ থেকেও আমরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করছি। অতি সম্প্রতি আমাদের একটা বই বেরিয়েছে, এনার্জি সিকিউরিটি অব বাংলাদেশ। এটা অবশ্য খুব একটা যে কমপ্রিহেনসিভ তা না, তবে এখানে কিছু দিক নির্দেশনা আছে।

এবারে সাত নম্বর বক্তা। না, ছয় নম্বর। প্রথম থেকে অবশ্য নাম্বারিং করা হয়নি। মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে। রুহিন হোসেন প্রিন্স।

রুহিন হোসেন প্রিন্স : ধন্যবাদ। আমার অবশ্য খুব বেশি কথা নেই, কারণ ইতিমধ্যে বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা আন্দোলনে আছি। আমি এবং আমার পার্টি আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের যথার্থতা আরেকবার পরীক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ গেলাম। আমরা যখন ফুলবাড়ী গেলাম, দেখলাম হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। তাদের মধ্যে আদিবাসীরাও আছেন। আদিবাসীরা উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। উচ্ছেদের ভয়াবহতা তারা অতীত থেকেই জানে। তাদের চোখে মুখে যে ক্ষোভ দেখেছি তা বলার মত নয়। তাদের শেষ কথা এই যে তীর ধনুকের প্রস্তুতি রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যদিও তারা জানে এযুগে তীর ধনুক দিয়ে কিছু হবে না। বাঁচতে পারবে না, তাদের মরতে হবে। তারা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এশিয়া এনার্জি অনেক কথা প্রচার করছে, পরিবেশ অধিদপ্তর নাকি তাদের ছাড়পত্র দিয়েছে। আমি জানি না এটার অবস্থাটা কী।

আমাদের একটা মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে, আমাদের তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত কোন আইন নেই। আমরা যে যে তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলি, সেগুলোর আগে বাধ্য হয়েই অনেকগুলো যদি/কিন্তু লাগাতে হয়

অধ্যাপক আসিফ নজরুল
আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটা পাখির প্রজাতি হারিয়ে গেলে আইইউসিএন যে কান্নাকাটি করে তা দেখলে আমাদের খুব কষ্ট হয়। আইইউসিএন কিন্তু পরিবেশ নিয়ে কোনো কথা বলছে না

শুভ কিবরিয়া
সমন্বয়কারী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

পরিবেশ অধিদপ্তরে আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কেউ কোনো কথা বলতে চায় না। আমাদের আরো যারা বন্ধু আছে তারা গত পরশুদিন শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরি মোড়ে বিক্ষোভ করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকশ কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল। অথচ এই বিক্ষোভের খবর বড় বড় কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে ড. আসিফ নজরুল বিস্তারিত বলেছেন। এই ধরনের অবস্থা এখন দেশে বিরাজ করছে। তাই আমাদের বোধ হয় আরো বেশি মাঠে থেকে কাজ করা দরকার। সেই মাঠের কাজের একটু উদাহরণ দেই। গতকাল রাতে একটা বিয়ের দাওয়াতে কমিউনিটি সেন্টারে গিয়েছি। ওখানে বারবার মাইকিং করছিল টেবিলের পাশে 'মোবাইল রাখিবেন না।' যার যার মোবাইল পকেটে রাখুন'। খেতে বসে কানের পাশে বারবার এই ধরনের আওয়াজ বিরক্তিকর আমি হাত ধুয়ে এসে ঘোষককে পাকড়াও করলাম। বার বার এরকম করার কারণ জানতে চাইলাম। ঘোষক বলল, ভাই এভাবে না করে তো উপায় নাই। আপনার অসাবধানতায় আপনার মোবাইল চুরি হবার পর আপনি কিন্তু আমাকে এসেই ধরবেন। তাই আপনাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আমার মনে হয় আমাদের দেশের সম্পদ কারা চুরি করছে আমরা জানি। এই সম্পদ রক্ষার বা জ্বালানি নিরাপত্তা দায়িত্ব যাদের দিয়েছি তারা আবার এটা বিদেশীদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে। এই চক্রে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তাই আমাদেরকে রাজপথে থেকে বার বার এভাবে মাইকিং করার মতো করে স্লোগানে স্লোগানে জনগণকে সচেতন করে রাখতে হবে এবং জনগণের শক্তিকে কাজে লাগিয়েই অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের অধিকার আদায় করতে হবে এবং রব্বানী ভাইয়ের কথায় মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। বিবেচনা সেখানে রেখেই আমার সকল অধিকার আমি প্রতিষ্ঠা করব। ধন্যবাদ সকলকে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ। এবারে শুভ কিবরিয়া, বিশ্বসাতিহ্য কেন্দ্র।

শুভ কিবরিয়া : ধন্যবাদ। আমার আসলে বলার কিছু নেই। আমি আকাশ স্যারের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। আকাশ স্যার জিজ্ঞেস করছিলেন ফুলবাড়ীতে কয়লা উঠল, কয়লা যদি বিদেশে চলে যায়, আমাদের যখন লাগবে তখন আমরা কি করব? একই ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে টাটার ক্ষেত্রে। টাটাকে যদি গ্যাস দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর যদি আমাদের গ্যাস ফুরিয়ে যায়, তাহলে কী হবে? টাটা বলেছে, তখন মায়ানমার থেকে গ্যাস কিনে ওদেরকে দিতে হবে। ফুলবাড়ীতেও ঐ একই অবস্থা হবে। আমাদের কয়লা আমাদেরকেই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কিনতে হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, তার আগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসিফ নজরুলকে। উনি বেশ সোজা সাপ্টা কথা বলেন এবং এরকম কিছু বিষয় তিনি আজকের আলোচনায় তুলে এনেছেন। আমরা অনেকদিন ধরে পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করি। অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাদের আছে। মুশফিক ভাই তাদের একজন। উনি এশিয়া এনার্জির জেনারেল ম্যানেজার। যতবারই তার সঙ্গে ফোনে কথা হয় তিনি আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করেন, ২০০০-এর সাজেদুরের কাছে কৈফিয়ত তলব করেন, কেন এটা করছ। এক ধরনের থ্রেট এই কৈফিয়ত তলবের মধ্যে থাকে। আমি তাকে বলেছি আপনি সামনা-সামনি আসেন। এভাবে কথা হয় না। তিনি সামনে আসেননি। সাংবাদিকদের কথা এসেছে। আমরা দেখলাম এশিয়া এনার্জির পয়সায় ৮ জন সাংবাদিক অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছে। পত্র-পত্রিকায় আমরা তাদের নাম দেখেছি। ঘুরে আসার পর তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব বদলে গেছে, এই তালিকায় প্রথম আলোর সাংবাদিকের নামও আছে। এটা একটা সমস্যা। এগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। একটা পাখির প্রজাতি হারিয়ে গেলে আইইউসিএন যে কান্নাকাটি করে তা দেখলে আমাদের খুব কষ্ট হয়। আইইউসিএন কিন্তু পরিবেশ নিয়ে কোনো কথা বলছে না। কামাল হোসেন সাহেবের কথা এসেছে। আমরা নাইকোর সময় দেখলাম তিনি আমাদের সঙ্গে ফাইট করলেন। তার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ালেন রোকনউদ্দিন মাহমুদ সাহেব। নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই নেই। এই একই মানুষ কীভাবে আদালতে দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বুঝতে পারি না। ফুলবাড়ীর বন্ধু যে কথাটা বলেছেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদি এত বড় বড় লোকজনদের কেনাবেচার সুযোগ থাকে, তাহলে ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি আরো বেশি মানুষ কেনাবেচা করবে। মানুষে মানুষে হানাহানি হবে। কানসাটের মতো পরিস্থিতি হবে। কাজেই ফুলবাড়ী থেকে এশিয়া এনার্জিকে এখনই সরাতে হবে। যেদিন তারা লিজ পাবে সে দিন তারা যাবে। কিন্তু এখন তারা ওখানে কি করে? ধন্যবাদ।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ, শুভ কিবরিয়া, এরপরে আমি বদরুল ইমামকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। বদরুল ইমামের বক্তব্য ছাড়া বোধহয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবে না।

বদরুল ইমাম : আমি খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখব। এনার্জি সিকিউরিটির ব্যাপারে একাধিক প্রশ্ন আপনারা করেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা যারা এই বিষয়টা নিয়ে আন্দোলন করছেন, তারা নিজেদের অবস্থানকে আরো একটু শক্ত করেন। বাংলাদেশ এখন বছরে কতটুকু কয়লা ব্যবহার করছে? সরকারি হিসেবে বছরে এক মিলিয়ন টনও না। কোল পলিসি বলছে যে ১০ বছরের মধ্যে আমরা ২০ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করব। ২০ বছরের মধ্যে গিয়ে সেটা দাঁড়াবে বছরে ৪০ মিলিয়ন টন। এই

আদিবাসীরা উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। উচ্ছেদের ভয়াবহতা তারা অতীত থেকেই জানে। তাদের চোখে মুখে যে ক্ষোভ দেখেছি তা বলার মত নয়। তাদের শেষ কথা এই যে তীর ধনুকের প্রস্তুতি রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই

রুহিন হোসেন প্রিন্স
কেন্দ্রিয় সদস্য, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি

যে এক মিলিয়ন থেকে ২০ মিলিয়ন তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ৪০ মিলিয়ন, উৎপাদনের এই বর্ধিত রূপটা তো ওপেনপিক ছাড়া সম্ভব নয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে কোলের রিকভারি অনেক কম হয়। বড় পুকুরিয়ায় যে আন্ডারগ্রাউন্ড কোল মাইন আছে সেখানে ৩০০ মিলিয়ন টন কয়লা মজুদ আছে। সেখানে থেকে ৬০ মিলিয়ন টন উৎপাদন করা যাবে বলে তারা মনে করছে। তার মানে মোট ২০ শতাংশ কয়লা উৎপাদন করা যাবে। ওপেন পিকে গেলে ৯০ শতাংশ রিকভারি করা যায়। তাই কোল পলিসিতে যে বলা হচ্ছে প্রথমে ২০ মিলিয়ন টন এবং পরে ৪০ মিলিয়ন টন করে কয়লা উৎপাদন করা হবে, তার মানে তারা আরো ওপেন পিক মাইনিংয়ের পরিকল্পনা করছে। এখন এখানে ফুলবাড়ীয়ার একজন লোক আছেন। কয়েকদিন পরেই বড়পুকুরিয়া থেকেও লোক আসবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওপেন পিক মাইনিংয়ের যে সমস্যা সেটা শুধু ফুলবাড়ীর না। আশঙ্কা করা যেতে পারে, সরকার এই মাইনিং পদ্ধতি অন্যান্য কয়লা খনির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা শুরু করবে। তাই বলছিলাম যে আপনাদের সবার বেল্টটা একটু টাইট করতে হবে। আরো শক্ত অবস্থান নিতে হবে। স্টাটিসটিক্যাল ডেটাগুলো আমাদের সবার জানা দরকার। এনার্জি সিকিউরিটির কথা যেটা বলা হচ্ছে যে ২০১১ সালে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে, আসলে তা না। গ্যাসের ডিমান্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে গ্যাসের সংকট শুরু হবে, গ্যাস শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে বাংলাদেশের এনার্জি সিকিউরিটি নাই। আমাদের খনিজ সম্পদ তেমন না থাকায় সঙ্গত কারণেই কয়লার ওপর নির্ভর করতে হবে। দেশে এনার্জি সিকিউরিটি অর্জন করা একটা কথা, আর এনার্জি উদ্ধারে বিদেশীদের লিজ দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা ব্যাপার। ধরেন কোন একটা কোম্পানি যদি কোনো একটা ক্ষেত্র ডেভেলপ করতে চায় এবং আমরা যদি মনে করি এ ক্ষেত্রটার উন্নতি করা দরকার তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে মাটির নিচ থেকে যা তোলা হবে, সেটা আমরা পাব কি না। যদি এমন হয় যে বিদেশী কোম্পানি ১৬ মিলিয়ন টন কয়লা তুলল, আর ১২ মিলিয়ন টন বিদেশে রপ্তানি করল, তাহলে তো আমরা আসলে ৪ মিলিয়ন টন কয়লা পেলাম। সুতরাং এখানে এমন কিছু ইস্যু আছে যেগুলো সুশীল সমাজকে সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করতে হবে। সরকারকে দরকার হলে চাপ দিতে হবে। আমরা এখন এই পর্যায়ে আছি এবং এই পর্যায়ে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ধন্যবাদ আমরা এখন প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি। আগে এখানে কমপ্লেইন ছিল যে আমাদের অনেক উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তারা আসেননি। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তার আগে এনার্জি পলিসি নিয়ে আমি কিছু কথা বলি। আমাদের কোথাও স্বচ্ছতা নেই। এবং ব্যাপারটাকে এমন করা হয়েছে যে অনেকেই বলে দিয়েছে কিছু কিছু তথ্য পাবার অধিকার আমাদের নেই। আমি জানি একজন সচিব রিটায়ার্ড করার পরে আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি পরবর্তী সচিবের কাছে, যিনি তার জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন, একটা ডকুমেন্ট চেয়ে পাননি। এই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এরপর আছে তথ্য প্রবাহের কথা। ভারতের কাছে আমরা নদী সংযোগ প্রকল্পের তথ্য চাচ্ছি। অন্য দেশের কাছে চেয়ে কি লাভ, আমরা নিজের দেশেই তো কোনো তথ্য পাই না। কাজেই অবাধ তথ্য প্রবাহের ব্যাপারটা প্রথমে নিজের দেশে চালু করতে হবে। মানুষকে তথ্য জানার সুযোগ দিতে হবে। এ জন্য আমাদের জোরাল অবস্থান নিতে হবে। এখন সর্বশেষ বক্তব্য রাখার জন্য আমি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে অনুরোধ করছি। তাকে ধন্যবাদ, দেরিতে হলেও তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : কথা দিয়েছিলাম, তাই কথা রাখতে আসা। যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সে বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই। এই ব্যাপারে যাদের জ্ঞান আছে, তারা অবশ্য এখানে আসবে না। একটা জিনিস আমি বুঝি আমাদের দেশের জলাশয়গুলো দেখাশোনা করার জন্য খরচ হয় ১৫০০ কোটি টাকা। আর এখান থেকে আয় হয় বছরে ১২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১২ হাত কাকুরের ১৩ হাত বিচি। তাহলে যদি জলাশয়গুলো ছেড়ে দেয়া হয়, যদি মানুষই এগুলোতে করে খায়, তাহলে আমার লসটা কোথায়? এই জিনিসগুলো আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে। রাজনীতিকে যদি নিয়মের মধ্যে না আনতে পারা যায়, একে যদি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে না পারা যায়, তাহলে লুটপাট, ধ্বংস ইত্যাদি চলতেই থাকবে। আমরা পাঁচ বছর দেশ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছিলাম। আমরা চেষ্টা করেছিলাম রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সেক্টরে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে, জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে। এনার্জির ক্ষেত্রে আমাদের খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। দেশের সম্পদ দেশে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, তার সবকিছুই করতে হবে। অনেক সময় এক্সপার্টরাও বিক্রি হয়ে যান। দেশ উজাড় করে সম্পদ বিদেশে পাচারের সব চক্রান্ত রুখতে হবে। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প সম্পর্কে আপনারা বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ৫০ হাজার খরচ করে আমার ৪৫ হাজার টাকা আসছে। অর্থাৎ লস হচ্ছে ৫ হাজার টাকা। ঘটনা যদি এ রকমই হয়, তাহলে এই প্রকল্প চালু করার মানে কী? তাছাড়া ফুলবাড়ীর মানুষজনকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারটাও সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা যদি আগামীতে ক্ষমতায় যাই, তাহলে এনার্জি পলিসি তৈরি করব বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে। কোনো একটা অংশের স্বার্থে নয়, সবার স্বার্থে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

> ওরা ওখানে অবস্থান করে নেতাদের কিনতে চাচ্ছে। জনগণ তো কখনো বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় নেতৃবৃন্দ। জনগণ চায় না এশিয়া এনার্জির লোকজন ওখানে থাকুক। ওরা ওখানে অবস্থান করলে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাতৃত্ব থাকবে না
>
> **আমিনুল ইসলাম বাবলু**
> ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির সদস্য

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে যাচ্ছে। আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে চাই আওয়ামী লীগ কি এই ইস্যুতে সংসদে কথা বলবে?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : একটা কথাতেই আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমি জানি না পার্লামেন্টে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : আমরা আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। বলা হয়েছে এক্সপার্ট লেভেলেও মানুষ কেনাবেচা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা সত্য নয়। এক্সপার্টরা সাধারণত বিক্রি হন না। আসলে দেশের প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে তখনই বিক্রি হওয়া সম্ভব। আসুন আমরা একযোগে কাজ করি। দেশের মানুষের ক্ষতি করে, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের সিদ্ধান্তে ফুলবাড়ীর মানুষের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দৃঢ়ভাবে 'না' বলি। আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত প্রতিহত করি। ধন্যবাদ সবাইকে।

গোলটেবিলের সমন্বয়কারী : **সাজেদুর রহমান**
সহযোগিতায় : **খোন্দকার তাজউদ্দিন, আরিফ খান মিরণ, সাইমন মোহসিন**
গ্রাফিক্স : **শেখ মঈনুল ইসলাম**